স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িকী

৫ম বর্ষ ❑ তৃতীয় সংখ্যা ❑ ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০১৬

সম্পাদক
ডা. পুণ্যব্রত গুণ

কার্যনির্বাহী সম্পাদক
ডা. জয়ন্ত দাস

সহযোগী সম্পাদক
ডা. পার্থপ্রতিম পাল ❑ ডা. সুমিত দাশ

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা
ডা. অভিজিৎ পাল ❑ ডা. অমিতাভ চক্রবর্তী
ডা. অনুপ সাধু ❑ ডা. আশীষ কুমার কুন্ডু
ডা. চঞ্চলা সমাজদার ❑ ডা. দেবাশিস চক্রবর্তী
ডা. শর্মিষ্ঠা দাস ❑ ডা. শর্মিষ্ঠা রায়
ডা. তাপস মণ্ডল ❑ ডা. সোহম সরকার

বিন্যাস ও অঙ্গসজ্জা ❑ নিত্য দাস, মনোজ দে, গোপাল সরকার, দুনিয়া গঙ্গোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ ❑ উৎপল বসু

বিনিময় ২০ টাকা

প্রকাশক
গোপাল সরকার
স্বাস্থ্যের বৃত্তে-র তরফে
দাসপাড়া (আংশিক), পূর্ব বুড়িখালি, বাউরিয়া
উলুবেড়িয়া,
হাওড়া ৭১১৩১০

মুখ্য পরিবেশক
বিশাল বুক সেন্টার
৪ টোটি লেন, কলকাতা ৭০০ ০১৬
ফোন : ২২৫২-৭৮১৬ / ৩৭০৯ / ৯১৬৭

মুদ্রক
এস এস প্রিন্ট, নরসিংহ লেন, কলকাতা ৭০০০০৯

অসুস্থ শিশুর চিকিৎসা কোথায় করা হবে?
সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে বাচ্চাদের নতুন নতুন ওয়ার্ড—নিকু, পিকু, এসএনসিইউ, ইত্যাদি। কোন বাচ্চাকে কোথায় ভর্তি করা হয় সে ব্যাপারে দু-চার কথা।
লিখেছেন ডা. সব্যসাচী পাণ্ডে
৯

নবজাতকের মৃত্যু: দায়ী কে?
খোদ কলকাতায় মেডিক্যাল কলেজে যখন দুই সদ্যোজাতর মৃত্যু হয়, তা একটু বেশি ‘সেনসিটিভ’, বেশি ‘খবর’, হয়ে ওঠে। তার বিভিন্ন দিক টেবিলে রেখে কাটাছেঁড়া করলেন **ডা. অনীক চক্রবর্তী।**
১২

বুকে ব্যথা মানে ইস্কিমিক হৃদরোগের সম্ভাবনা
ভারী কাজ করলে, বা ভারী খাওয়া-দাওয়ার পরে, বুকে ব্যথা হলে ইস্কিমিক হৃদরোগের লক্ষণ হতে পারে — লিখছেন **ডা. কুশল সেন ও ডা. মৃন্ময় বেরা।**
৪

বুকে ব্যথা মানেই হার্ট অ্যাটাক নয়
হার্টের ব্যথা ছাড়াও অন্য কারণে বুকের ব্যথা হতে পারে। সেখানে কী করবেন, জানাচ্ছেন **ডা. পুণ্যব্রত গুণ।**
৭

কর্ড ব্লাড ব্যাঙ্ক: কাজের না অকাজের
আজকাল বাচ্চা জন্মানোর সময় তার ‘ভবিষ্যতের নিরাপত্তার জন্য’ কর্ড ব্লাড সংরক্ষণ করে লাখখানেক টাকা নিয়ে রাখে অনেক বেসরকারি হাসপাতাল। সেটা কিন্তু নীতিবিরুদ্ধ—জানাচ্ছেন **ডা. কাঞ্চন মুখার্জি।**
২৯

স্বাস্থ্যের বৃত্তে পত্রিকায় স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত লেখা জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয়। এইসব লেখা পড়ে কেউ নিজের বা অন্যের চিকিৎসা করবেন না, করলে সেই চিকিৎসার ফলে যে অসুবিধা বা বিপদ ঘটতে পারে, তার দায় সম্পূর্ণভাবেই সেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির। *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* সেজন্য কোনোভাবেই দায়ী থাকবে না।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৩

বুকে ব্যথা মানে ইস্কিমিক হৃদরোগের সম্ভাবনা: ৪
ডা. কুশল সেন ও ডা. মৃন্ময় বেরা

বুকে ব্যথা মানেই হার্ট অ্যাটাক নয়: ডা. পুণ্যব্রত গুণ ৭

অসুস্থ শিশুর চিকিৎসা কোথায় করাবেন? ডা. সব্যসাচী পাণ্ডে ৯

নবজাতকের মৃত্যু: দায়ী কে? ডা. অনীক চক্রবর্তী ১২

মেডিক্যাল কলেজে শিশু-মৃত্যু: সম্পাদকীয় তদন্ত ১৪

একটি কেস স্টাডি: ডা. তুহিন রায় ১৭

খাদ্য দ্বারা সংক্রমণ ও 'হু'-র পাঁচ চাবি: ডা. নীহাররঞ্জন মণ্ডল ১৯

২০১৫ বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ঘোষিত নিরাপদ খাদ্য বছর: ২০
ডা. নীহাররঞ্জন মণ্ডল ও শ্রী শুভদীপ মল্লিক

ডাক্তারবাবু: ডা. অনিরুদ্ধ দেব ২২

কুসুমবাই-সন্দীপ্তাকে মনে রেখে **মেয়েদের স্বাস্থ্যভুবন** ২৭

কর্ড ব্লাড ব্যাঙ্ক—কাজের না অকাজের? ডা. কাঞ্চন মুখার্জী ২৯

সাধভক্ষণ: দিলীপ ঘোষ ৩২

মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার কোড অফ এথিক্স রেগুলেশন, ২০০২ ৩৪
অনুবাদ: দুনিয়া গঙ্গোপাধ্যায়

জঙ্গলমহলে অলৌকিক ফুঁ, রোগ সারার গুজব ও বিজ্ঞানের জয়: সৌম্য সেনগুপ্ত ৩৮

বিশ্বাস ও মৌলবাদ: কিছু তত্ত্ব ও মতামত: রুমঝুম ভট্টাচার্য ৪০

মাত্রা ছাড়া রক্তচাপ: ডা. গৌতম মিস্ত্রী ৪২

কোন বয়সে কীসের টিকা কেন দেব? ডা. স্বপন বিশ্বাস ৪৬

টুকরো খবর

- **বেশিক্ষণ বসে কাজ করলে লিভারের রোগ হতে পারে** ৫১
- **পক্ষাঘাতগ্রস্ত হাতের স্পর্শবোধ ফেরাল এক কৃত্রিম ব্যবস্থা** ৫২
- **বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ অপুষ্টির শিকার** ৫৩
- **কীটনাশক থেকে ডায়াবেটিস** ৫৩

পুস্তক সমালোচনা

শেষে আমরা কী চাই? ডা. পুণ্যব্রত গুণ ৫৪

সবার জন্য স্বাস্থ্যের দাবিতে গাজীর গান: দীপক চক্রবর্তী ৫৬

শব্দছক ৩: প্রস্তুতি রুচিরা মজুমদার ৫৬

বাণিজ্যিক নয়, মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক বাংলা পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান

কলেজ স্ট্রিট অঞ্চল

পাতিরাম
বুকমার্ক
পিপলস বুক সোসাইটি
বই-চিত্র
মনীষা গ্রন্থালয়
নিউ হরাইজন বুক ট্রাস্ট

কলকাতার অন্যত্র

অমর কোলের স্টল (বিবাদি বাগ)
এস কে বুকস (উল্টোডাঙা)
লেখনী, ২/৪৬ নাকতলা, কলকাতা ৭০০ ০৪৭,
কল্যাণদার স্টল (রাসবিহারী মোড়)
বইকল্প (ঢাকুরিয়া)
দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি (উত্তর কলকাতা)
জ্ঞানের আলো (যাদবপুর ৮বি বাসস্ট্যান্ড)

কলকাতার বাইরে

শ্রমিক কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র (চেঙ্গাইল)
ধানসিড়ি (রায়গঞ্জ)
পুষ্প নিউজ এজেন্সি (মালদহ, ফোন ৯৯৩২৯৬৭৯৯১)
জাতিস্মর ভারতী (জলপাইগুড়ি, ফোন ৯৯৩২৩৫৪৯৫৮)
প্রয়াস মল্লভুম (লোকপুর, বাঁকুড়া, ফোন ৯৪৩৪২২৭৪৯৯)
মাধব পেপার স্টল, (বালুরঘাট বাসস্ট্যান্ড, ফোন ৯৯৩২৪৫৫২৪৪)
প্রদীপন গাঙ্গুলি (দার্জিলিং, ফোন ৮৫৩৫৮৯৫৩৯২)
আনন্দম(মাথাভাঙা, বরুণ সাহা, ৯৮৩৪৩৩৭৭৬৮, ৯৭৩৩১১৬৪৪২ সোমা দত্ত
(হাওড়া, ফোন ৮৯২৬২৮৬২৬৪)

পাঠক ও লেখক পত্রিকার লেখার বিষয়ে যোগাযোগ করুন:
৯৮৩০৯২২১৯৪, ৯৩৩১০১২৫৩৭
পত্রিকা পাওয়ার জন্য পাঠক ও এজেন্টরা যোগাযোগ করুন: ৯৮৩০৮৮৬৪৪১, ৯৪৭৭০২৮১৫৭
ইমেল: swasthyerbritte@gmail.com

'স্বাস্থ্যের বৃত্তে'-র গ্রাহক হোন।
সডাক গ্রাহক চাঁদা ৬টি সংখ্যার জন্য ১৮০ টাকা।
Swasthyer Britto-র নামে চেক বা ড্রাফট পাঠান এই ঠিকানায়-
এইচ এ ৪৪, সল্টলেক, সেক্টর ৩, কলকাতা ৭০০ ০৯৭
আউটস্টেশন চেকে ৩০ টাকা আরও যোগ করুন
অথবা
NEFT-র মাধ্যমে টাকা পাঠান এই অ্যাকাউন্টে
Swasthyer Britto
A/c No.0315101025024
Canara Bank, Princep Street Branch
IFSC Code: CNRB0000315

সম্পাদকীয়

গত নভেম্বরের শেষ নাগাদ মেডিক্যাল কলেজে শিশুদের জন্যই তৈরি এক বিশেষ ইউনিটে ভর্তি ছিল দুই শিশু। ওয়ার্মারটি অতিরিক্ত গরম হবার জন্য তারা মারা যায়। এরপর সংবাদপত্র-টিভি-সোশ্যাল-মিডিয়ায় শোরগোল ওঠে, কয়েকজন নার্স ও ডাক্তারের শাস্তিবিধানের পর এই আখ্যানটি ক্রমশ লোকস্মৃতিতে আবছা হতে থাকে। কিন্তু আমরা কিছু নতুন শব্দ শিখি, নিকু-পিকু-এসএনসিইউ ইত্যাদি, এবং ভাবতে বসি, আমার বাচ্চাটার যদি কিছু হয়, তাহলে কোথায় তাকে ভর্তি করব? এইসব নিকু-পিকু-এসএনসিইউ কি মানুষ-মারার নতুন কল, নাকি নতুন হাই-টেক সমাধান? সোশ্যাল মিডিয়ার আধুনিক চণ্ডীমণ্ডপের রায় বোধহয় এই রকমই যে সরকারি ব্যবস্থা গোল্লায় গেছে, ডাক্তার-নার্স সব হৃদয়হীন ডাকাত; সুতরাং চালাও পানসি কর্পোরেট হাসপাতালে। আফটার অল, বাচ্চার জীবন নিয়ে কথা, পয়সা খরচা হলে হবে!

মুশকিল হল, বাস্তবটা হিন্দি সিনেমা নয়, তার দায় নেই আপনার জন্য শেষপাতে রসগোল্লার মতন গোল-গোল সমাধান বানিয়ে দেবার। চণ্ডীমণ্ডপে পুরোনো ভিলেন আর নতুন নায়ক তৈরি করা সোজা। কিন্তু তাদের ড্রেসিং রুমে একবারও উঁকি না মারলে নিজের ঘরে আগুন লাগলে জল খুঁজতে গিয়ে পেট্রোল ঢালার অবস্থা হতে পারে। বড়ো অস্বস্তিকর কিছু উত্তরবিহীন প্রশ্ন তাড়া করে। কেন দু-ডজন বাচ্চার জন্য সেই রাত্রে একজন মাত্র নার্স ডিউটিতে ছিলেন, যেখানে ইন্টেনসিভ কেয়ারের জন্য সরকারি নিয়মে চারজন রোগীপিছু একজন নার্স? কেন কোনো জুনিয়র ডাক্তারের ওইখানে থাকার ব্যবস্থা না-থাকা সত্ত্বেও ওখানেই ইউনিটটি করতে হল? কেন একটি ওয়ার্মারে একাধিক বাচ্চা রাখার বেনিয়মটাই নিয়ম? ওয়ার্মার তো আর মায়ের কোল নয় যে বাচ্চাকে বাঁচানোর ওম-ই দেবে শুধু; ঠান্ডা-হয়ে-আসা বাচ্চার জন্য সে বিষুব-অরণ্যের সূর্য, কিন্তু তার স্বয়ংক্রিয় তাপ মাপার যন্ত্র যদি শিশুর গা থেকে খুলে যায়, তবে সে-ই সাহারার আগুন-ঝরানো প্রাণঘাতক। সে রাত্রে একটি ওয়ার্মারে থাকা তিনটি শিশুর একজনের গায়েই কেবল তাপ মাপার যন্ত্র লাগানো ছিল, আর সেই শিশুকে সরিয়ে নিয়েছিলেন তার মা। দু-ডজন বাচ্চাকে সারারাত দেখভাল করা আর দুধ খাওয়ানোর ফাঁকে প্রাণঘাতী ওয়ার্মারের ওপর নজর রাখতে গেলে টানা আট ঘণ্টা যে উসেইন বোল্ট-সম দৌড়বাজি দেখাতে হয়, নার্সিং ট্রেনিং-এ তার ব্যবস্থা আছে তো?

আর সরকারি হাসপাতালগুলোকে দুর ছাই করে যাঁরা কর্পোরেট হাসপাতালের নধর চাকচিক্যে বিমোহিত, তাঁরা জানেন তো বন্ধ দরজাগুলোর ওপারে আপনার শিশু ঠিক কতটা যত্ন পাবে? সব বেসরকারি হাসপাতাল এক রকম নয়, সেটা মাথায় রাখলে আপনারই মঙ্গল। মনে রাখবেন মুনাফা ধর্ম মুনাফা স্বর্গ যেখানে, সেখানে খুব দক্ষ নার্সের তেমন দাম নেই, কেননা আপনি তো আর নার্স দেখে সেখানে যাবেন না, যাবেন বিজ্ঞাপন, চকচকে বাড়ি আর দামি ডাক্তারের টানে। নার্স আর জুনিয়র ডাক্তার নামক নিষ্ফলা খাতে অধিক ইনভেস্টমেন্টে শেয়ারহোল্ডাররা আপত্তি তুলবেন যে!

এরপরেও নিজের স্বার্থে কিছু কথা বুঝে নেবার থাকে। হাসপাতাল নিয়ে, তার নানা বিভাগ ওয়ার্ড ইউনিট নিয়ে নানা কথা। চটজলদি সিদ্ধান্ত নেবার বাজারি মিডিয়া আর সোশ্যাল মিডিয়ার ক্যাঙারু কোর্টে চালু চুটকিগুলোর মতো মিষ্টি-সরস নয় এই কথাগুলো। তারপরেও কথাগুলো আপনি পড়বেন কিনা, সেগুলো নিয়ে ভাববেন কিনা, প্রশ্ন তুলবেন কিনা, সেটা আপনাকেই স্থির করতে হবে।

স্বাস্থ্যের বৃত্তে কেবল লিখতে পারে। শিশুদের বাঁচাতে পারে না। আপনারা সেটা পারেন। একা একা। এবং একযোগে।

বুকে ব্যথা মানে ইস্কিমিক হৃদ্‌রোগের সম্ভাবনা

ভারী কাজ করলে বুকে ব্যথা? ভারী খাওয়া-দাওয়ার পরেও? গ্যাস-অম্বলের ব্যথা ভেবে অবহেলা করবেন না, হয়তো এটাই ইস্কিমিক হৃদ্‌রোগের লক্ষণ—লিখেছেন **ডা. কুশল সেন ও ডা. মৃন্ময় বেরা।**

আপনার কি ভারী কাজ করলে বা অনেক হাঁটাচলা করলে বুকে ব্যথা হয়? পিন ফোটার মতো বা মুচড়ে দেওয়ার মতো? দুপুরে ভারী খাওয়া-দাওয়ার পরেও কি একই রকম অনুভূতি হয়? গ্যাস-অম্বলের ব্যথা ভেবে অবহেলা করবেন না। এটা ইস্কিমিক হৃদ্‌রোগের প্রাথমিক লক্ষণ হতে পারে।

কী এই ইস্কিমিক হৃদ্‌রোগ?

ডাক্তারি পরিভাষায় ইস্কিমিয়া বলতে আমরা বুঝি আমাদের শরীরের কোনো কোষ বা কলাতে রক্ত সরবরাহ কমে যাওয়া এবং ফলস্বরূপ সেই কোষ বা কলাতে তাদের প্রয়োজনীয় অক্সিজেন না পৌঁছোনো। আমরা জানি যে হৃৎপিণ্ড আমাদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত শরীরের সর্বত্র রক্ত সরবরাহ সুনিশ্চিত করে তার পাম্প-ক্ষমতা দিয়ে। এই কাজ করার জন্য শক্তি তথা অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়। এবং তা আসে কিছু সরু সরু ধমনি থেকে। এদের বলা হয় হৃদ্‌ধমনি (coronary arteries)। কোনো কারণে এই ধমনিগুলো সরু হয়ে গেলে বা বন্ধ হয়ে গেলে হৃদ্‌পেশির প্রয়োজনীয় রক্ত ও তার সঙ্গে অক্সিজেন সরবরাহ ব্যাহত হয়। এইভাবে হৃদ্‌পেশিতে অক্সিজেনের চাহিদা এবং জোগানের ভারসাম্যহীনতার ফলে হৃৎপিণ্ডের যে রোগ হয় তাকেই ইস্কিমিক হৃদ্‌রোগ (সংক্ষেপে IHD) বলে। এই রোগই তার তীব্রতর রূপ হার্ট অ্যাটাক নিয়ে প্রকাশ পেতে পারে।

কীভাবে এই হৃদ্‌ধমনিগুলো বন্ধ বা সরু হয়ে যেতে পারে?

আমাদের শরীরের কোথাও কেটে গেলে সেখানে রক্ত জমাট বাঁধে। অর্থাৎ জমাট বাঁধতে পারাটা সংবহনতন্ত্রের একটা বৈশিষ্ট্য। তেমনি প্রবহমান রক্ত রক্তনালীর অভ্যন্তরের মসৃণ দেওয়ালে জমাট বাঁধে না----এটাও সংবহনতন্ত্রের একটা বৈশিষ্ট্য। আমাদের রক্তে চর্বির পরিমাণ বেশি হলে তা ধমনির দেওয়ালে আস্তরণ ফেলতে শুরু করে। এর ফলে সংবহনতন্ত্রের যে বৈশিষ্ট্যের জন্য প্রবহমান রক্ত জমাট বাঁধে না, সেই বৈশিষ্ট্য ওই ধমনিগুলিতে আর থাকে না। ফলে ওই সব জায়গায় ধমনির ওই চর্বি আস্তরণের ওপরে তঞ্চিত রক্তের আস্তরণ পড়ে, ও ধমনিগুলো জায়গায় জায়গায় সরু হয়ে যায়, এমনকী বন্ধও হয়ে যেতে পারে। এ ছাড়া কখনো কখনো ধমনির পেশিসমৃদ্ধ দেওয়ালের সংকোচনের ফলেও ধমনিগুলি সরু হয়ে যেতে পারে, কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্য।

কাদের এই রোগ দেখা যেতে পারে:

- যারা অত্যধিক ধূমপান করেন বা তামাক জাতীয় দ্রব্যের নেশা করেন,
- যাদের উচ্চ-রক্তচাপ আছে,
- যাদের রক্তে শর্করা অথবা/এবং চর্বির মাত্রা বেশি থাকে,
- মানসিক চাপ বা Stress থেকেও এই রোগ হতে পারে,
- জিনগত ও বংশগতভাবেও এই রোগের প্রাদুর্ভাব লক্ষ করা যেতে পারে।

রোগের লক্ষণ:

১. বুকে ব্যথা বা অ্যানজাইনা পেক্টোরিস:

হালকা চিনচিনে ব্যথা থেকে অসহ্য বুকে ব্যথা, স্বল্পস্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী—অনেকরকমভাবে এই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়, মনে হয় বুকের ভিতরটা কেউ পিষে দিচ্ছে বা মুচড়ে দিচ্ছে। আবার অনেকক্ষেত্রে ব্যথার বদলে বুকে অস্থিরভাব নিয়েও এই রোগ দেখা দিতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুই কাঁধে অথবা বাহুর দিকে এই ব্যথা সম্প্রসারিত (referred pain) হয়। এই ব্যথা বা অস্থিরভাব ঘটে হৃদ্‌পেশিতে অক্সিজেনের চাহিদা ও জোগানের অসমতা থেকে। রোগের তীব্রতার ওপর এই বুকে ব্যথা বা অস্বস্তির ভিন্নতা দেখা যায়—এর ওপর ভিত্তি করে এই বুকে ব্যথাকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়।

● **স্টেবল অ্যানজাইনা** (Stable angina): এই ক্ষেত্রে বুকে ব্যথা বা অস্থিরভাব ভারী কাজকর্ম, বেশি হাঁটাচলা, সিঁড়ি ওঠা বা মানসিক চাপের (stress) সময় হয় এবং বিশ্রাম নিলে কমে যায়। এই ব্যথা ২-১০ মিনিট স্থায়ী হয়।

● **আনস্টেবল অ্যানজাইনা** (Unstable angina): এই জাতীয় বুকে ব্যথা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এবং ১০ মিনিটের বেশি স্থায়ী হয়, বিশ্রাম নিলেও এই ব্যথা কমে না, জিভের তলায় নাইট্রেট জাতীয় ওষুধ দিয়ে ব্যথা কমাতে হয়, অনেক সময় তাতেও পুরোপুরি ব্যথা কমে না। এই রোগে সাধারণত হৃদ্‌পেশির ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার চিহ্ন থাকে না। হৃদ্‌পেশি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সুনির্দিষ্ট চিহ্ন ইসিজি করে রক্তে বিভিন্ন হৃদ্‌উৎসেচকের মাত্রা বৃদ্ধি দেখে বা ইকোকার্ডিওগ্রাফির মাধ্যমে বোঝা যায়। তবে যেকোনো সময়ে এই আনস্টেবল অ্যানজাইনা হার্ট অ্যাটাকে রূপান্তরিত হতে পারে। সেই কারণে এ ক্ষেত্রে রোগীকে তৎক্ষণাৎ নিকটবর্তী হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন।

● **অ্যাকিউট করোনারি সিনড্রোম** (Acute Coronary Syndrome, সংক্ষেপে ACS) এবং অ্যাকিউট মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন (Acute Myocardial Infarction, সংক্ষেপে AMI): এক্ষেত্রে হৃদ্‌পেশি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া শুরু হয়। রোগীর বুকে হঠাৎ করে খুব ব্যথা শুরু হয় এবং তা ৩০ মিনিটের বেশি স্থায়ী হয়, এমনকী কয়েকদিন পর্যন্ত হতে পারে। যদিও মনে রাখা দরকার এই AMI/ACS হওয়ার জন্য পুরো ইস্কিমিক হৃদ্‌রোগ বা IHD থাকাটা জরুরি নয়, আপাতভাবে সুস্থ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও আকস্মিকভাবে AMI/ACS হতে পারে। এই ক্ষেত্রে যদি রোগীর রক্তে হৃদ্‌উৎসেচকের উপস্থিতি থাকে, তাকে আমরা AMI বলে থাকি নয়তো ACS বলি। এরা আবার দু-রকম হতে পারে।

AMI হৃদ্‌উৎসেচক উপস্থিত ACS হৃদ্‌উৎসেচক উপস্থিত নয়	ACS (হৃদ্‌সেচক উপস্থিত থাকে না)	ST elevation (ইসিজি-তে ST অংশ ওঠা থাকে)। এক্ষেত্রে এক বা একাধিক হৃদ্‌ধমনি হঠাৎ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়।
AMI হৃদ্‌উৎসেচক উপস্থিত ACS হৃদ্‌উৎসেচক উপস্থিত নয়।	AMI হৃদ্‌উৎসেচক উপস্থিত থাকে	Non ST elevation (ইসিজি-তে ST অংশ ওঠা থাকে না)। এক্ষেত্রে হৃদ্‌ধমনি আংশিকভাবে বন্ধ হয়।

২. দীর্ঘদিন ধরে হৃদ্‌পেশিতে রক্ত ও অক্সিজেন না পৌঁছানোর জন্য হৃদ্‌পেশির মৃত্যু ঘটে। ফলে হৃদ্‌যন্ত্র ঠিকমতো রক্ত পাম্প করতে পারে না। এর ফলে হার্টফেলের বিভিন্ন লক্ষণ যেমন শ্বাসকষ্ট, অল্পেতে হাঁফিয়ে পড়া, বুকে ধড়ফড়, পা ফোলা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা যেতে পারে। লক্ষ করবেন, চলতি বাংলায় আমরা যে বলি, ''লোকটা হঠাৎ হার্টফেল করে মরে গেল'', সেখানে হার্টফেল বলতে কিন্তু আমরা মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশনই বুঝিয়ে থাকি। কিন্তু এখানে ডাক্তারি পরিভাষায় হার্টফেল করা বলতে বোঝায় হৃদ্‌যন্ত্রের ঠিকমতো রক্ত পাম্প করতে না পারা।

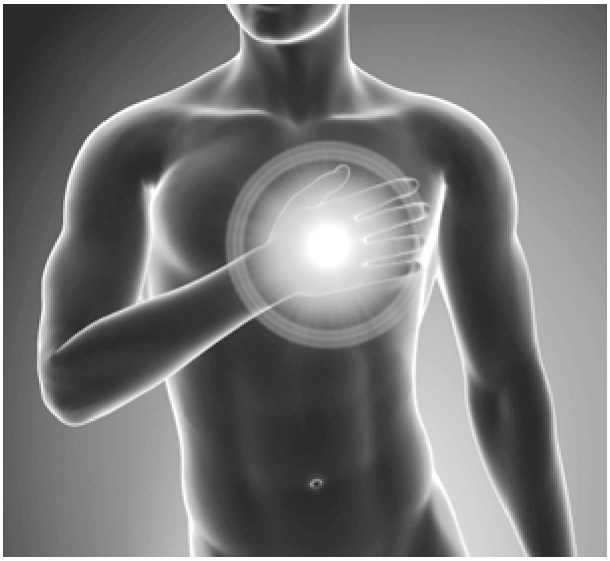

৩. **নিঃশব্দ ইস্কিমিক হৃদ্‌রোগ** (silent IHD): এই ক্ষেত্রে রোগীর বুকে ব্যথা থাকে না, কিন্তু বিশ্রামরত অবস্থায় বা পরিশ্রম করার সময় (resting or stress) ইসিজি বা ইকোকার্ডিওগ্রাফিতে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। মধুমেহ রোগীদের এই ধরনের ব্যথাহীন ইস্কিমিক হৃদ্‌রোগ দেখা যায়।

রোগ নির্ণয়

১. **ইসিজি:** রক্ত ও অক্সিজেন সরবরাহ কমে যাওয়ায় হৃদ্‌পেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সেক্ষেত্রে ইসিজিতে বিশেষ পরিবর্তন (ST-T changes, abnormal Q wave) দেখা যায়। কিন্তু শুধুমাত্র ইসিজি দেখে রোগ নির্ণয় করা সম্ভব বা উচিত নয়।

২. **রক্তে শর্করা ও চর্বির মাত্রা:** এই হৃদ্‌রোগীদের রক্তে চর্বি ও শর্করার মাত্রা বেশি থাকার সম্ভাবনা অন্য পাঁচজনের চাইতে বেশি, কিন্তু তা বলে চর্বি ও শর্করার মাত্রা স্বাভাবিক থাকলেই এই রোগ হবে না, এমন বলা যায় না।

৩. **ইকোকার্ডিয়োগ্রাফি:** এই পরীক্ষার সাহায্যে হৃদ্‌যন্ত্রের বিভিন্ন দেওয়ালের পেশিগুলির চলমানতা বা কার্যক্ষমতা বোঝা যায়। হৃদ্‌যন্ত্রের কোন দিকে পেশি বেশি ক্ষতিগ্রস্ত সেটা বুঝে, কোন ধরনের করোনারি ধমনি বন্ধ হয়েছে তার একটা আভাস পাওয়া যায়।

৪. **টিএমটি, স্ট্রেস ইকোকার্ডিওগ্রাফি, ২৪ ঘণ্টা হল্টার মনিটরিং** (TMT, STRESSECHO, 24HR HALTER): কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে রোগী হাঁটাচলা করলে বা ভারী কাজ করলে তবেই বুকে ব্যথা হয়, বিশ্রামরত অবস্থায় কোনো অসুবিধে থাকে না এবং বিশ্রামরত অবস্থায় করা ইসিজি বা ইকোকার্ডিওগ্রাফিতে রোগের চিহ্ন পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে রোগীকে ট্রেডমিল টেস্ট বা স্ট্রেস ইন্ডিউসড ইসিজি করালে রোগের চিহ্ন পাওয়া যাবে। একই ভাবে স্ট্রেস ইকোকার্ডিওগ্রাফিও করানো যেতে পারে।

২৪ ঘণ্টা হল্টার মনিটরিং, বা ব্যাটারি চালিত যন্ত্রের সাহায্যে সারা দিনব্যাপী হৃদ্‌যন্ত্রের ইসিজি রেকর্ড করা, হল এমন পরীক্ষা যার মাধ্যমে দিনের বিভিন্ন সময়ে হৃদ্‌পেশিতে রক্ত সরবরাহের ভিন্নতা ও তার ফলে ইসিজিতে পরিবর্তন ধরা পড়ে।

প্রতিরোধ:

অত্যধিক চর্বিজাতীয় খাবার, শারীরিক শ্রম কম করে জীবনযাপন, ধূমপান বা তামাকজাতীয় দ্রব্যের অন্যভাবে নেশা করা, মানসিক চাপ—এসবকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারলে, ও রক্তচাপ, রক্তে শর্করার মাত্রা ও রক্তে চর্বির মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখলে এই রোগকে প্রতিরোধ করা সম্ভব।

উচ্চরক্তচাপ, মধুমেহ রোগ, রক্তে চর্বির মাত্রা বেশি থাকলে রোগীদের একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর (বছরে অন্তত একবার) ইসিজি বা সম্ভব হলে ইকোকার্ডিওগ্রাফি করালে প্রাথমিক স্তরে এই রোগ নির্ণয় ও সেই স্তরেই এই রোগকে সীমিত রাখা সম্ভব।

চিকিৎসা:

এখানে আমরা বহির্বিভাগে মুখে ওষুধ খাইয়ে চিকিৎসার কথা বলব। ACS বা AMI-এর ক্ষেত্রে থ্রম্বলাইসিস (ইঞ্জেকশন দিয়ে রক্ত তরল করা), অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি বা হৃদ্‌ধমনির বাইপাস সার্জারি ইত্যাদি যেসব চিকিৎসা হাসপাতালে ভর্তি রেখে হয়, তা পরে বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে।

প্রাথমিকভাবে প্রয়োজন এই রোগের ঝুঁকির কারণগুলো (risk factor) নির্ণয় করা ও তার চিকিৎসা করা। এই সঙ্গে নিম্নলিখিত গ্রুপের ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা শুরু করা।

- **অ্যাসপিরিন:** কম মাত্রায় অ্যাসপিরিন (দৈনিক ৭৫-১৫০ মিলিগ্রাম) রক্তকে তরল রাখাতে সাহায্য করে। ফলে চর্বির প্রলেপ পরা এবড়োখেবড়ো দেওয়াল-বিশিষ্ট ধমনির গায়ে রক্ত জমাট বাঁধার সম্ভাবনা

কমে। রোগী অ্যাসপিরিন সহ্য করতে না পারলে, অথবা অ্যাসপিরিনে অ্যালার্জি থাকলে ক্লপিডোগ্রেল (৭৫ মিলিগ্রাম দৈনিক) দেওয়া যেতে পারে —এটাও রক্ত তঞ্চন আটকায়। কিন্তু ক্লপিডোগ্রেল-এর দাম অ্যাসপিরিনের থেকে অনেক বেশি। কোনো কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে রোগীকে অ্যাসপিরিন এবং ক্লপিডোগ্রেল দুই ধরনের ওষুধ একসঙ্গে ব্যবহার করতে হতে পারে।

- **জৈব নাইট্রেট:** এই গ্রুপের ওষুধ রক্তনালীর দেওয়ালকে প্রসারিত করার ফলে রক্ত সরবরাহ কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পায় এবং বুকে ব্যথা কম হয় (anti-anginal ওষুধ)। আইসোসরবাইড ডাইনাইট্রেট (আমাদের পরিচিত ট্রেড নাম 'সরবিট্রেট'), আইসোসরবাইড মনোনাইট্রেট, গ্লিসারিল ট্রাইনাইট্রেট—এরা এই গ্রুপের ওষুধ।
- **স্ট্যাটিন:** এই গ্রুপের ওষুধ, যেমন অ্যাটরভ্যাস্ট্যাটিন, রোগীর রক্তে চর্বির মাত্রা কমাতে সাহায্য করে।
- **বিটা-ব্লকার:** যথা অ্যাটেনেলল, মেটোপ্রোলল ইত্যাদি; এরা হৃদ্স্পন্দনের গতি কমিয়ে হৃদ্পেশির অক্সিজেন চাহিদা কমায়।
- **অ্যাঞ্জিওটেনসিন কনভার্টিং এনজাইম ইনহিবিটর বা অ্যাঞ্জিওটেনসিস রিসেপ্টার ব্লকার:** যেমন এনালাপ্রিল, লোসারটন। এরা সাধারণভাবে উচ্চরক্তচাপ কমানোর ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হলেও উপযুক্ত মাত্রায় এই ওষুধ হৃদ্পেশির অন্যভাবে গড়ে ওঠা (remodeling) আটকায়; ইস্কিমিক হৃদরোগে মৃত্যুর হার কমাতেও এই ওষুধের ভূমিকা আছে।
- এ ছাড়াও পটাশিয়াম চ্যানেল ওপেনার (নিকরানডিল), আংশিক ফ্যাটি অ্যাসিড জারণ প্রতিহতকারী (Partial Fatty acid Oxidase inhibitor যথা ট্রাইমেটাজিডিন), লেট সোডিয়াম চ্যানেল ব্লকার র‍্যানোলাজিন এই রোগে বুকে ব্যথা কমাতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

বুকে ব্যথা হলে কী করবেন:

মনে রাখবেন, অধিকাংশ বুকে ব্যথার কারণ হার্টের রোগ ছাড়া অন্য কিছু। সুতরাং বুকে ব্যথা হলে প্যানিক করবেন না। ডাক্তার দেখাবেন এবং ডাক্তারের উচিত হল আপনার বুকে ব্যথার ধরনটা ভালো করে ইতিহাস নিয়ে বুঝে নেওয়া। তারপর দরকার মতো পরীক্ষা। মনে রাখবেন, হৃদ্রোগে ব্যথা মানেই কিন্তু হার্ট অ্যাটাক নয়। হার্ট অ্যাটাক তথা মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন হলে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে থ্রম্বোলাইটিক ওষুধ শিরাতে ইঞ্জেকশন করে চিকিৎসাই আমাদের দেশে প্রাপ্য চিকিৎসাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভালো; জরুরি ভিত্তিতে অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি ইত্যাদি করার মতো ব্যবস্থা এখানে কোথাও নেই। আর হার্ট অ্যাটাক নয় কিন্তু অন্য হৃদরোগে—সেক্ষেত্রে সবার আগে দরকার রোগের চরিত্র ও রোগের স্টেজ নির্ণয় করে চিকিৎসা করা।

এবং মনে রাখবেন, সেসব ক্ষেত্রে আপনার সবচেয়ে বড়ো চিকিৎসক হতে পারেন আপনিই। খাদ্য ও ব্যায়াম, বিশেষ করে হাঁটা, সাঁতার কাটা জাতীয় অ্যারোবিক ব্যায়াম করে আপনিই পারেন নিজেকে সুস্থ রাখতে। ওষুধ খেতে ভুলবেন না, কেননা সেটা এ রোগে প্রাণদায়ী। কিন্তু কোনো ওষুধই তেমন কাজের হবে না যদি না আপনি খাওয়া ও ব্যায়াম নিয়ে মনোযোগী না হন। **স্বাস্থ্যের বৃত্তে**

ডা. কুশল সেন ও ডা. মৃন্ময় বেরা কলকাতার এক সরকারি মেডিক্যাল কলেজের হৃদ্রোগ বিভাগের জুনিয়র ডাক্তার।

বুকে ব্যথা মানেই হার্ট অ্যাটাক নয়

বুকে ব্যথা হলে, বিশেষত বেশি বয়সে, ভয় তো হয়ই—হার্টের ব্যথা নয় তো! কিন্তু বুকে তো কেবল হার্ট থাকে না, বুকের দেওয়ালে থাকে হাড়, মাংসপেশি, ভিতরে হার্ট ছাড়াও থাকে দুটো ফুসফুস, শ্বাসনালী, গ্রাসনালী, ছোটো-বড়ো অনেকগুলো রক্তনালী। সেসব থেকেও বুকের ব্যথা হতে পারে। হার্টের ব্যথা সন্দেহ করবেন কখন, আর কী কী কারণে বুকে ব্যথা হতে পারে, কখন কী করবেন—লিখেছেন **ডা. পুণ্যব্রত গুণ**।

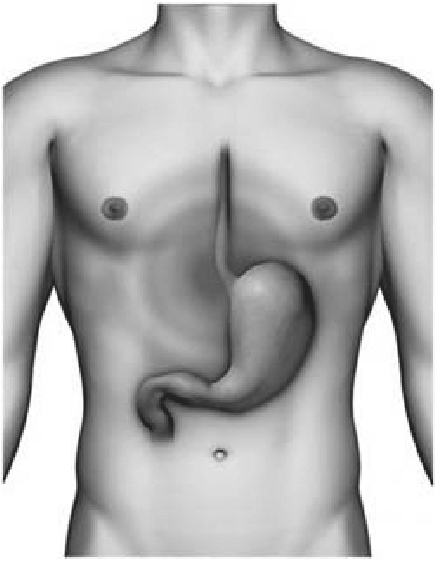

বক্ষগহ্বরে কেবল হার্ট থাকে না। বক্ষগহ্বরে দেওয়ালে থাকে----পিছনে মেরুদণ্ডের বারোটা হাড় বা কশেরুকা, সামনে চ্যাপটা হাড় স্টারনাম, কশেরুকা থেকে স্টারনাম অবধি দু-দিকে থাকে বারো জোড়া পাঁজর। পাঁজরগুলোর মাঝে ও অন্যত্র থাকে মাংসপেশি। মাংসপেশির ওপর কয়েকটা আবরণী, একদম ওপরের আবরণী হল চামড়া। বুকের গহ্বরের মধ্যে দু-দিকে থাকে দুটো ফুসফুস, দুটো ফুসফুসের মাঝে একটু বাঁ-দিক ঘেঁষে হৃৎপিণ্ড বা হার্ট। হৃৎপিণ্ডের পেছন দিয়ে প্রধান শ্বাসনালীর পেছনে নামে গ্রাসনালী। এ ছাড়া বুকের ভিতর আছে ছোটো-বড়ো অনেকগুলো রক্তনালী। পেট থেকে বক্ষগহ্বরকে আলাদা করে এক মাংসের পর্দা—ডায়াফ্রাম বা মধ্যচ্ছদা। এসবের রোগেও বুকে ব্যথা হতে পারে। মধ্যচ্ছদার নীচে ডানদিক থেকে মাঝখান পেরিয়ে থাকে লিভার বা যকৃৎ। বাঁ-দিকে থাকে স্প্লীন বা পিলে (প্লীহা)। আর মাঝ বরাবর একটু বাঁ-দিক ঘেঁষে থাকে পাকস্থলী, গ্রাসনালী দিয়ে খাবার যেখানে এসে পৌঁছোয়। এগুলোর রোগেও বুকে ব্যথা ছড়াতে পারে।

বুকে ব্যথার কারণ যে প্রধান রোগগুলো, সেগুলোর উপসর্গ-লক্ষণ ও চিকিৎসা নিয়ে কিছু কথা জেনে নিই, আসুন।

হার্টের ব্যথা

বুকের মাঝের হাড় স্টারনামের পেছনে ব্যথা, সাধারণত বাঁ হাতে নামে। উপরে চোয়াল থেকে নীচে পেট অবধি যেকোনো জায়গায় ব্যথা হতে পারে। মধ্যবয়স্ক বা বেশিবয়সিদের বেশি দেখা যায়। হঠাৎ করে, সাধারণত পরিশ্রম করার পর, ব্যথা শুরু হয়। সাধারণত শ্বাসকষ্ট থাকে না। রোগীকে অসুস্থ ও উদ্বিগ্ন দেখায়। রোগী ঘামতে থাকেন। তাপমাত্রা, নাড়ীর গতি ও শ্বাসগতি স্বাভাবিক থাকে। বুকের কোথাও টিপলে ব্যথা লাগে না। অনেক সময় পেটভরা খাবার খেয়ে বা ঠান্ডায় বা খুব আবেগে ব্যথা শুরু হয়। দু-তিন মিনিট বিশ্রাম নিলে ব্যথা কমে যায়।

জিভের নীচে আইসোসরবাইড ডাইনাইট্রেট ৫ মিলিগ্রাম বড়ি দিলে ব্যথা কমে, বাজারে এ ওষুধ সরবিট্রেট (Sorbitrate) নামে বহুল-পরিচিত। এমন ব্যথা হলে ডাক্তারের শরণাপন্ন হোন, ইসিজি ও অন্যান্য পরীক্ষা করে টানা চিকিৎসায় থাকতে হতে পারে।

হার্ট অ্যাটাক বা হার্টের মাংসপেশির একাংশে রক্ত-চলাচল বন্ধ হওয়া

স্টারনামের পেছনে ব্যথা, উপরে চোয়াল থেকে নীচে পেট অবধি যেকোনো জায়গায় ব্যথা নামতে পারে। ব্যথা দু-হাতেই নামতে পারে, তবে সাধারণত বাঁ হাতে নামে। সাধারণত মধ্যবয়স্ক ও বেশি বয়স্কদের হলেও কমবয়সিদেরও হতে পারে এ রোগ। হঠাৎ করে ব্যথা শুরু হয়, রোগী যখন বিশ্রাম নিচ্ছেন সে সময়েও ব্যথা শুরু হতে পারে। খুব বেশি শ্বাসকষ্ট হয়। রোগীকে খুব অসুস্থ দেখায়, নেতিয়ে পড়েন, ছটফট করতে থাকেন, বমি হতে পারে। ফ্যাকাশে লাগে। রোগী ঘামতে থাকেন। তাপমাত্রা স্বাভাবিক থাকে, নাড়ীর গতি থাকে বেশি, মিনিটে ৯০ থেকে ১২০, শ্বাসগতি মিনিটে ২৪-এর বেশি। বুকের কোথাও টিপলে ব্যথা লাগে না। নাড়ীর গতি অনিয়মিত হতে পারে, হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে গেলে বুকে চাপ দিয়ে তা চালু করার চেষ্টা সঙ্গে সঙ্গে করা দরকার। বুকে ব্যথা কমানোর জন্য জিভের নীচে আইসোসরবাইড ডাইনাইট্রেট বড়ি দিন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে গেলে অনেক সময় ওষুধ ইঞ্জেকশন করে জমাট-বাঁধা রক্তকে গলিয়ে দিয়ে রক্তনালীকে অবরোধমুক্ত করা যায়। কখনো অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি বা বাইপাস অপারেশন লাগে। অপারেশন না করতে হলেও ওষুধ চলবে সারাজীবন।

বুকজ্বালা

এ রোগের পোশাকি নাম গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ বা জিইআরডি। পাকস্থলীর পাচকরস ও অ্যাসিড এ রোগে পাকস্থলী থেকে গ্রাসনালীতে উঠে আসতে থাকে। স্টারনামের পুরোটার পেছনে জ্বালাভাব হয়। যেকোনো বয়সে হতে পারে। ব্যথার আগে কিছুটা বদহজম হতে পারে। শ্বাসকষ্ট থাকে না। রোগীকে অসুস্থ দেখায় না। তবে বমি হতে পারে। তাপমাত্রা, নাড়ীর গতি, শ্বাসগতি ঠিকঠাক থাকে। বুকে কোথাও টিপলে ব্যথা লাগে না, তবে পেটের ওপর ভাগে মাঝখানটায় টিপলে ব্যথা লাগে।

বাড়িতে অ্যান্টাসিড বড়ি থাকলে দুটো খেয়ে নিন, অ্যান্টাসিড তরল থাকলে দু-চামচ। র‍্যানিটিডিন ১৫০ মিগ্রা বড়ি বা ওমপেরাজোল ২০ মিগ্রা ক্যাপসুলও খেতে পারেন অ্যান্টাসিডের বদলে। সঙ্গে ডমপেরিডন বড়ি—বড়োরা ১০ মিলিগ্রামের বড়ি একটা খেতে পারেন।

হার্পিস জোস্টার

বুকের একদিকে পাঁজরের ওপর ব্যথা, ওই অংশে জলবসন্তের মতো অনেক ফোসকা থাকে। শ্বাস নিতে গেলে ব্যথা লাগে।

প্রথম অবস্থায় ডাক্তারের কাছে গেলে ভাইরাস মারার ওষুধ অ্যাসাইক্লোভির খেলে ভোগান্তি একটু কমে। না হলেও ঘা শুকিয়ে যায়। ব্যথা কমানোর জন্য প্যারাসিটামল খেতে হয়। তবে চামড়ার ঘা শুকানোর পরও ব্যথা থেকে যেতে পারে, তখন ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী অ্যামিট্রিপ্টিলিন বা গাবাপেন্টিনের মতো কোনো নার্ভের ব্যথা কমানোর ওষুধ খেতে হতে পারে।

প্লুরিসি বা ফুসফুসের আবরণীর প্রদাহ

পাঁজরের যেকোনো অংশে ছুরি মারার মতো ব্যথা হয়, শ্বাস নিলে বা কাশলে ব্যথা বাড়ে। যেকোনো বয়সেই প্লুরিসি হতে পারে। অল্প শ্বাসকষ্ট থাকে। এ রোগে তাপমাত্রা, নাড়ীর গতি, শ্বাসগতি—তিনটেই বেশি থাকে। ব্যথা কমানোর জন্য আপাতত প্যারাসিটামল খান। তবে ডাক্তার দেখাতেই হবে—কোন জীবাণু থেকে প্লুরিসি তা দেখে তিনি জীবাণু মারার ওষুধ দেবেন।

নিউমোনিয়া

যেকোনো বয়সে বুকের যেকোনো জায়গায় ছুরি মারার মতো ব্যথা, শ্বাস নিলে ও কাশলে বাড়ে। হঠাৎ করে কষ্ট শুরু হতে পারে বা ধীরে ধীরে, তবে সাধারণত শুরুটা হয় সর্দি-কাশি দিয়ে। রোগীকে বেশ অসুস্থ দেখায়, মুখটা লাল হয়ে থাকে। বেশি শ্বাসকষ্ট থাকে, তা থেকে রক্তে অক্সিজেন কমে ঠোঁট ও কান নীল হতে পারে। ঘাম দেয়, তাপমাত্রা থাকে ৩৯ থেকে ৪০.৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। নাড়ীর গতি মিনিটে ১০০ থেকে ১৩০। শ্বাসগতি বেশ বেড়ে যায়, মিনিটে ৩০ থেকে ৫০। প্রথমে লাগাতার শুকনো কাশি হতে থাকে, তারপর লালচে কফ উঠতে থাকে।

ব্যথা কমাতে প্যারাসিটামল ব্যবহার করা যায়। জল বেশি করে খেলে ও গরম জলের ভাপ নিলে কফ পাতলা হয়। তবে অবশ্যই ডাক্তার দেখিয়ে জীবাণুনাশক ওষুধ নিতে হবে।

নিউমোথোরাক্স

মানে থোরাক্স অর্থাৎ বক্ষগহ্বরে ফুসফুসের আবরণী প্লুরার মধ্যে হাওয়া জমা। বুকে ছুঁচালো কিছু বিঁধে এমনটা হতে পারে, আবার ফুসফুসের হাওয়ার থলি আপনা থেকে ফেটে গিয়েও এমন হতে পারে। বুকের যেকোনো জায়গায় তীক্ষ্ণ ব্যথা হয় হঠাৎ করে। শ্বাসকষ্ট হয়, তা থেকে ঠোঁট ও কান নীল হয়ে যেতে পারে। তাপমাত্রা স্বাভাবিক থাকলেও নাড়ীর গতি ও শ্বাসগতি কিছুটা বাড়ে।

এমনটা সন্দেহ হলে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। বুকে নল ঢুকিয়ে হাওয়া বার করতে হয়।

পিত্তথলির প্রদাহ

পেটের ডানদিকে উপরিভাগে ব্যথা, বুকের নীচের অংশে ব্যথা বলে মনে হতে পারে। ভাজাভুজি ও তেলালো খাবারে ব্যথা বাড়ে। ব্যথা পিঠের ডানদিকের তেকোনো হাড় (স্ক্যাপুলা) বা ডান কাঁধে ছড়ায়। যেকোনো বয়সে হতে পারে, তবে মধ্যবয়স্ক বেশি ওজনের মানুষদের বেশি দেখা যায়। বমি হয়। তাপমাত্রা, নাড়ীর গতি ও শ্বাসগতি কিছুটা বেশি থাকে। পেটের ডানদিকে উপরিভাগে টিপলে ব্যথা লাগে।

সাময়িক ব্যথা কমানোর জন্য হায়োসিন বুটাইল ব্রোমাইড (পরিচিত ব্র্যান্ড Buscopan) ব্যবহার করা যায়। সাধারণত পিত্তথলির প্রদাহে সঙ্গে পাথর থাকে, অপারেশন করাতে হবে।

পিত্তনালীর কামড়ানো ব্যথা

ব্যথার জায়গা পিত্তনালীর প্রদাহের মতো, তবে কামড়ানো ব্যথা, কেননা পিত্তনালীতে পাথর আটকানোর কারণে ব্যথা হয়। হঠাৎ করে ব্যথা শুরু হয়। যেকোনো বয়সে হতে পারে, তবে মধ্যবয়স্ক বেশি ওজনের মানুষদের বেশি দেখা যায়। পেট কামড়ে ব্যথার সময় শ্বাসকষ্ট হয়। বমিভাব থাকে, বমি হয়। তাপমাত্রা সাধারণত স্বাভাবিক থাকে, তবে নাড়ীর গতি ও শ্বাসগতি কিছুটা বেশি থাকে। পেটের ডানদিকে উপরিভাগে টিপলে ব্যথা লাগে।

সাময়িক ব্যথা কমানোর জন্য হায়োসিন বুটাইল ব্রোমাইড (পরিচিত ব্র্যান্ড Buscopan) ব্যবহার করা যায়। পাথরটাকে বার করার জন্য অপারেশন লাগে, তাই এমন ব্যথা হলে ডাক্তারকে দেখানোই চাই।

বুকে ভোঁতা চোট

আঘাতের জায়গায় তীক্ষ্ণ ব্যথা হয়। শ্বাস নিলে ব্যথা বাড়ে। আঘাতে পাঁজর ভেঙে ফুসফুস ছিঁড়ে গেলে শক হতে পারে। শক থাকলে ঠোঁট ও কান নীল হয়ে যায়। নাড়ীর গতি ও শ্বাসগতি বেড়ে যায়। আঘাতের জায়গায় টিপলে ব্যথা লাগে।

কফে রক্ত-মেশা ফেনা আছে কিনা দেখুন, তেমনটা হলে ফুসফুসে চোট লেগেছে, ডাক্তারি সহায়তা চাই। শক না থাকলে পর্যাপ্ত মাত্রায় প্যারাসিটামল ও ব্যথার জায়গায় শুকনো গরম সেঁকে আস্তে আস্তে ব্যথা কমবে, পুরো কমতে ৩-৪ সপ্তাহ লাগতে পারে।

মাংসপেশির ব্যথা

সাধারণত পিঠের উপর দিকে ব্যথা হয়। তেমন কোনো লক্ষণ থাকে না। প্যারাসিটামল খেতে পারেন ব্যথা কমাতে।

তাহলে দেখলেন তো বুকে ব্যথা মানেই হার্টের ব্যথা নয়। বুকে ব্যথার কারণগুলো জানা থাকলে অহেতুক ভয় পেতে হয় না বেশির ভাগ সময়।

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. পুণ্যব্রত গুণ, এমবিবিএস, হাওড়ায় একটি শ্রমজীবী মানুষের জন্য ক্লিনিকের সর্বক্ষণের চিকিৎসক।

অসুস্থ শিশুর চিকিৎসা কোথায় করাবেন?

ডা. সব্যসাচী পাণ্ডে

কিছুদিন আগে মেডিক্যাল কলেজে ওয়ার্মার-এ দু-টি ছোটো ছোটো বাচ্চার মৃত্যু হয়েছে। মিডিয়াতে তাই নিয়ে শোরগোল পড়ে গেছে। ব্যাপারটি শুধু দুঃখজনক নয়, ভয়ের ব্যাপারও বটে। সাধারণ মানুষ অনেকেই জানতেন না, সরকারি-বেসরকারি নানা হাসপাতালে ছোটো বাচ্চাদের জন্য নানারকম নতুন ব্যবস্থা হয়েছে। তাঁরা এখন জানছেন, আর 'নিকু', 'পিকু', 'এসএনসিইউ', ইত্যাদি নানা নামের গোলকধাঁধায় অনেকেই হাবুডুবু খাচ্ছেন। অনেকেই ভাবছেন, ওগুলো মরণফাঁদ, আবার অনেকে ভাবছেন, ওসব না হলে বাচ্চারা বাঁচবেই না। আসলে কোন বাচ্চাকে এইসব স্পেশালাইজড ওয়ার্ড বা ইউনিটে দেবার দরকার পড়ে, সেটা সাধারণ মানুষের জানা নেই, আর এদের সংক্ষিপ্ত নাম 'নিকু', 'পিকু'—এসব থেকে কিছু বোঝাও দায়। অবশ্য সংক্ষিপ্ত নামের বদলে যদি পুরো নামটাও লেখা হত, তা হলে হয়তো অল্প কিছু মানুষের খানিক ধারণা হত, কিন্তু তার বেশি কিছু হত না। এইসব জায়গায় ঠিক কী কাজ হয়, কেনইবা নানা স্পেশালাইজড ওয়ার্ড বা ইউনিট তৈরি করার দরকার পড়ল, সেটা বুঝতে গেলে এগুলোর কাজের ধারা অনেকটা বুঝতে হবে।

পিকু, নিকু, এসএনসিইউ, এসেএনএসইউ—এসবের মানে কী?

'পিকু' (PICU) মানে পিডিয়াট্রিক ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিট (Pediatric Intensive Care Unit), ২৮ দিন থেকে ১২ বছর বয়সের বাচ্চাদের জন্য। 'নিকু' (NICU) হল নিওন্যাটাল ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিট (Neonatal Intensive Care Unit), সাধারণভাবে জন্ম থেকে ২৮ দিন বয়সি শিশুদের নিবিড় পরিষেবার জন্য। আইসিইউ (ICU) বা ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিট (Intensive Care Unit) কথাটা এখন অধিকাংশের পরিচিত। আইসিইউ হল প্রাপ্তবয়স্কদের নিবিড় পরিষেবার জন্য, আর 'নিকু' বা 'পিকু' বাচ্চাদের আইসিইউ বলা যায়। এসএনসিইউ (SNCU) হল আবার আরেকটা শব্দ, 'সিক নিওন্যাটাল কেয়ার ইউনিট' (Sick Neonatal Care Unit), অসুস্থ নবজাতকের পরিষেবার জন্য; এতে ব্যবস্থা ও যন্ত্রপাতি 'নিকু'-র তুলনায় কম থাকে, এবং তুলনায় কম অসুস্থ, কম ঝুঁকির নবজাতকরা এখানে চিকিৎসা পায়। এসএনএসইউ (SNSU) মানে সিক নিওন্যাটাল স্টেবিলাইজিং ইউনিট (Sick Neonatal Stabilizing Unit); এটা প্রথম পর্যায়ের বিশেষ নবজাতক পরিষেবা, যাতে এসএনসিইউ-এর তুলনায়ও কম অসুস্থ, কম ঝুঁকির নবজাতকরা পরিষেবা পায়। আর যেসব জায়গায় প্রসব হয় (প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ইত্যাদি), সেখানে প্রসবাগারের সঙ্গেই অন্তত প্রাথমিক পর্যায়ের কিছু পরিষেবা থাকার কথা নবজাতকের জন্য; সেটার নাম 'এনবিসিসি' (NBCC) অর্থাৎ নবজাতকের পরিষেবা স্থান (New Born Care Corner)।

কেন এইসব বিশেষ ইউনিট বা ওয়ার্ড?

আজ থেকে মোটামুটিভাবে বছর দশ-বারো আগেও এইসব বিশেষ পরিষেবা নিয়ে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় সেরকম আলোচনা ছিল না। তাহলে এখন কেন এদের প্রয়োজন অনুভূত হল, এবং কীভাবে সেই প্রয়োজনকে বাস্তবে রূপায়িত করার প্রচেষ্টা করা হল, সেটুকু বুঝলেই আমরা বুঝে নিতে পারব সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থায় কোন স্তরে এগুলোর অবস্থান।

স্বাধীনতার পরবর্তী পর্যায়ে আমাদের দেশের শিশুমৃত্যুর হার (Infant Mortality Rate–IMR বা আইএমআর) ছিল ১৬৫। নবজাতকদের মৃত্যু হার (Neonatal Mortality Rate–NMR বা এনএমআর) ছিল ৮০। এ দুটোই ভয়ংকর রকমের বেশি। এরপর সরকারি বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রকল্পের বাস্তব রূপায়ণে নব্বই-এর দশকের মাঝামাঝি পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসে শিশুমৃত্যুর হার (আইএমআর) হয় ৭০ ও নবজাতক মৃত্যু হার হয় ৪৭। শিশুমৃত্যুর হার (আইএমআর)-এর অর্ধেকেই হল নবজাতক মৃত্যু হার (এনএমআর)। আবার নবজাতক মৃত্যু হার কমলেও, একেবারে সদ্যোজাতদের (জন্মের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে) মৃত্যু হার (Early Neonatal Mortality Rate–ENMR বা ইএনএমআর) কমতে না-ও পারে। কয়েকটি পরিসংখ্যান দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে—

সাল	২০০০	২০০২	২০০৪	২০০৬	২০০৮	২০১০	২০১২
আইএমআর	৬৮	৬৩	৫৮	৫৫	৫০	৪৪	৪২
এনএমআর	৪৪	৪০	৩৭	৩৭	৩৫	৩৩	২৯
ইএনএমআর	৩২	২৭	২৬	২৮	২৭	২৫	২৪

তাই সরকারি স্বাস্থ্য পরিকল্পনায় কিছু পরিবর্তন আনা হয়। শিশুমৃত্যু হার (আইএমআর) কমানোর জন্য মূল লক্ষ্য করা হয় নবজাতকের মৃত্যু হার (এনএমআর) এবং সদ্যোজাত নবজাতকের (জন্মের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে) মৃত্যু হার-কে নিয়ন্ত্রণে আনা।

নবজাতকের মৃত্যুর পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে দেখা যায় মৃত্যুর কারণ হিসাবে ক্রমপর্যায়টি নিম্নরূপ—

প্রিম্যাচিওর জন্ম ও জেনেটিক ত্রুটি—৩৫%

শ্বাসরোধ—২০%

সংক্রমণ—৩৩%

অন্যান্য—১২%

এই পরিপ্রেক্ষিতে নানা বিশেষ ইউনিট নিয়ে ভাবা হয়। প্রথমেই বলি এসএনসিইউ-এর কথা; পুরো নামটা হল সিক নিওনেটাল কেয়ার ইউনিট। এটি অসুস্থ নবজাতকদের (২৮ দিন বয়স পর্যন্ত) পরিষেবার জন্য তৈরি বিশেষ ইউনিট। পরীক্ষামূলকভাবে প্রথম এসএনসিইউ খোলা হয় পুরুলিয়া হাসপাতালে ২০০৩ সালে। ফলাফল বিশ্লেষণ করে পরবর্তী বছরে দেখা যায় সেখানে এনএমআর তাৎপর্যপূর্ণভাবে কমেছে। এরপর ২০০৫ সাল থেকে জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন (National Rural Health Mission-NRHM)-এর মাধ্যমে দেশব্যাপী এই প্রকল্প চালু করা হয়।

এই প্রাথমিক সাফল্যের পরে আটকানো সম্ভব এমন (preventable) নবজাতক মৃত্যু ও সদ্যোজাত মৃত্যুকে নিয়ন্ত্রণে আনতে তৈরি করা হয় চারটি পর্যায়—

১. এনবিসিসি (NBCC-New Born Care corner)—নবজাতকের পরিষেবা কর্নার।

২. এসএনএসইউ (SNSU-Sick Newborn Stabilizing Unit)—অসুস্থ নবজাতককে স্টেবল করার (বা স্থিতাবস্থায় আনার) ইউনিট।

৩. এসএনএসইউ (SNCU-Sick Neonatal Care Unit)—অসুস্থ নবজাতকের যত্নের জন্য ইউনিট।

৪. এনআইসিইউ (NICU-Neonatal ICU)—নবজাতকের ইন্টেসিভ পরিষেবার জন্য, কেবল তৃতীয় স্তরের হাসপাতালে (টার্শিয়ারি রেফারেল সেন্টারে) প্রাপণীয়।

এবার দেখা যাক এদের কোনটি কোথায়, ও কী কী ব্যবস্থা এগুলিতে আছে।

১. এনবিসিসি (NBCC): সমস্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্র যেখানে শিশু জন্মের ব্যবস্থা আছে। উদ্দেশ্য হল জন্মের সময় বাচ্চার প্রয়োজনীয় যত্ন (রিসাসিটেশন করা, উষ্ণ রাখা আর মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো শুরু করা) নেওয়া।

২. এসএনএসইউ (SNSU): নবজাতকের প্রথম পর্যায়ের বিশেষ পরিষেবা পাবার জায়গা। এখানে যেসব সদ্যোজাতের ওজন ১৮০০ গ্রামের বেশি, ও অন্তত ৩৪ সপ্তাহ মাতৃগর্ভে কাটানোর পর যারা জন্মেছে, তাদের যত্ন ও চিকিৎসা হয়। এই এসএনএসইউ থাকে ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা কখনো মহকুমা হাসপাতালে (যেখানে গড় বার্ষিক প্রসব ৫০০০-এর কম)।

৩. এসএনসিইউ (SNCU): নবজাতকের দ্বিতীয় পর্যায়ের বিশেষ পরিষেবা পাবার জায়গা। ১২০০-১৮০০ গ্রাম ওজনের ও ৩০-৩৪ সপ্তাহ মাতৃগর্ভে কাটানোর পর জন্মেছে এমন নবজাতকের জন্য এসএনসিইউ থাকার কথা সমস্ত জেলা হাসপাতাল ও মহকুমা হাসপাতাল বা এমন যেকোনো সরকারি হাসপাতালে যেখানে বার্ষিক প্রসব সংখ্যা ৫০০০-এর বেশি। এখানে থাকবে সর্বক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক ডাক্তার ও নার্স এবং অনেক আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি, যেমন—

- নবজাতককে ‘রিসাসিটেশন’ করার সমস্ত যন্ত্র
- তাপমান বজায় রাখার ব্যবস্থা
- নবজাতকের শিরায় তরল (‘স্যালাইন’) দেবার যন্ত্র/সিরিঞ্জ পাম্প
- ফোটোথেরাপি
- নল দিয়ে খাওয়ানোর ব্যবস্থা
- কনটিনিউয়াস পজিটিভ এয়ারওয়ে প্রেশার (CPAP)
- কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভেন্টিলেটর

৪. এনআইসিইউ (NICU) : বাংলায় এই শব্দটা ছোটো করে ‘নিকু’ বলার চল বেশি। এটা থাকে মেডিক্যাল কলেজের মতো তৃতীয় পর্যায়ের রেফারেল হাসপাতালগুলোতে। এটা হল নবজাতকের তৃতীয় দ্বিতীয় পর্যায়ের বিশেষ পরিষেবা পাবার জায়গা। যেসব নবজাতকের ওজন ১২০০ গ্রামের কম, বা যারা মাতৃগর্ভে ৩০ সপ্তাহের কম সময় কাটিয়ে জন্ম নিয়েছে, তাদের জন্য এই বিশেষ পরিষেবা। এতে আছে সমস্ত আধুনিক চিকিৎসাপদ্ধতিসহ অতিরিক্ত নার্স, এবং ২৪ ঘণ্টা ল্যাবরেটরি পরিষেবা।

এ ছাড়া কিছুদিনের মধ্যে আসতে চলেছে এইচবিএনসি (HBNC-Home Based Newborn Care)। এই ব্যবস্থায় যেসব সুস্থ নবজাতক বা শিশু হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি গেছে তাদের বাড়িতে গিয়ে জন্মের ৪২ দিন পর্যন্ত পরিষেবা দেবেন ‘আশা’ (ASHA) কর্মীরা। অন্যান্য কিছু রাজ্যে শুরু হলেও এই ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গে এখনও শুরু হয়নি।

আমাদের রাজ্যে বর্তমানে এসএনসিইউ রয়েছে ৪৩টি ও এসএনএসইউ রয়েছে ২৮৫টি।

এতক্ষণ আমরা কথা বললাম নবজাতকদের পরিষেবা নিয়ে। নবজাতক মানে জন্মের পর ২৮ দিন পর্যন্ত। কিন্তু ২৮ দিন বয়স থেকে ১২ বছর পর্যন্ত বয়সিরাও তো শিশু। তাদের বাচ্চাদের ইন্টেসিভ কেয়ার ইউনিট ‘পিকু’ (Paediatric Intensive Care Unit বা PICU)-র কথা ছোটো করে বলি এইবার। পিকু কোনো জেলাস্তর হাসপাতালে নেই। বর্তমানে এদের অবস্থান শুধুমাত্র তৃতীয় পর্যায়ের রেফারেল হাসপাতালে। পিকু মোটামুটিভাবে পরিকাঠামোগত দিক থেকে বড়োদের ICU-র মতোই যা শুধুমাত্র ১মাস থেকে ১২ বছর বয়সি শিশুদের পরিষেবা দিয়ে থাকে।

কখন কী ?

কোথায় অবস্থান তো জানা হল। এখন প্রশ্ন হল কখন কোথায় যাবেন ?

আসলে এই হিসেবটা অনেকটাই গোলমেলে। এ পর্যন্ত আলোচিত সরকারি পরিকল্পনামাফিক ব্যবস্থাপনা থাকলে এই বিষয়ে আপনার অতটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কথা নয়। নিটকবর্তী সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালে গর্ভাবস্থার নিয়মিত পরামর্শ গ্রহণ করলে আপনার নবজাত বাচ্চার প্রসব পরিকল্পনা এবং প্রয়োজনমতো রেফারেল সবটাই সময়মতো হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু সরকারি লক্ষ্যমাত্রা এবং তার বাস্তবায়নের তফাতটাই আমার আপনার উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

পরিকাঠামো তৈরি হওয়ার পর স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও হাসপাতালে প্রসবের হার বেড়ে গেছে অনেকটাই বিগত কয়েক বছরে। ফলে এত এত নতুন তৈরি এসএনসিইউগুলোর প্রতিটাই ভুগছে অতিরিক্ত রোগীর চাপে। সঙ্গে যোগ হয়েছে তুলনামূলক কম অসুস্থ বাচ্চাকে অকারণে এসএনসিউ-তে পাঠানো ও প্রিম্যাচিওর নবজাতকরা বেশি সংখ্যায় বাঁচার কারণে তাদের অতিরিক্ত হাসপাতালে থাকা। ফলত দেখা দিচ্ছে বেড-এর অভাব। এর ওপর আবার রয়েছে যথাযথ রেফার করার পর যথাযথ পরিবহণের অভাব। তাই বাচ্চাকে কোন জায়গায় নিয়ে গেলে যথাযথ চিকিৎসা পাবেন বলাটা অনেকটাই কঠিন।

এমনিতে কোন বাচ্চাকে কোথায় কখন পাঠানো হবে তার সরকারি নির্দেশিকা আছে যার নাম এফবিএনসি রেফারেল মডিউল (FBNC Referral Module) যা তৈরি সরকারি স্বাস্থ্যকর্মী, নার্স ও ডাক্তারদের জন্য। সেই অনুযায়ী—

এসএনএসইউ/এনবিএসইউ থেকে এসএনসিইউতে স্থানান্তর হবে যখন—

- বাচ্চা ঝিমিয়ে রয়েছে বা ক্রমশ নেতিয়ে পড়ছে।
- বুকের দুধ টানছে না।
- শরীর ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।
- খিঁচুনি হচ্ছে।
- শ্বাসকষ্ট হচ্ছে যেমন শ্বাস ছাড়ার সময় শব্দ করছে (Grunt), দ্রুত গতিতে শ্বাস নিচ্ছে বা বুকের খাঁচা ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে বা বাচ্চা শ্বাস নিচ্ছে না (apnoea)।
- পেট ফুলে যাচ্ছে।
- রক্তপাত দেখা যাচ্ছে।
- জন্ডিস অতিরিক্ত মাত্রায়।
- খুব কম ওজনের নবজাতক বা সময়ের অনেক আগে জন্মানো (মাতৃগর্ভে ৩৪ সপ্তাহ না কাটানো)—তাদের যদি কোনো রোগ লক্ষণ না-ও থাকে।

এসএনসিইউ থেকে এনআইসিইউ-তে স্থানান্তর

- বাচ্চাকে শ্বাসযন্ত্রের সাহায্যে কৃত্রিম শ্বাস দিতে হবে।
- রক্ত সঞ্চালন প্রাথমিক চিকিৎসার পরও ঠিক হচ্ছে না।
- জন্ডিসের কারণে রক্ত পরিবর্তন প্রয়োজন।
- খিঁচুনি, পর্যাপ্ত ওষুধের পরও নিয়ন্ত্রণে আসছে না।

• পেট ফুলে যাচ্ছে ও সঙ্গে রক্ত বা পিত্ত মিশ্রিত বমি হচ্ছে।
• এমন কোনো জন্মগত ত্রুটি রয়েছে যার জন্য দ্রুত অপারেশন প্রয়োজন।

. . . .

এ তো গেল সরকারি নির্দেশিকার কথা। এর পরের প্রশ্ন হল আপনার কী করণীয়। নিকটবর্তী চিকিৎসাকেন্দ্রে যাওয়া আপনার ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তবে কয়েকটি পরামর্শ মাথায় রাখলে হয়তো আপনার সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধা হতে পারে—

• যদি বাচ্চা প্রিম্যাচিওর (৩৪ সপ্তাহের কম গর্ভকাল) বা কম ওজনের (২ কেজির কম) হতে চলেছে মনে হয় তা হলে এসএনসিইউ রয়েছে এমন হাসপাতালে প্রসব হওয়াই ভালো। যদি অতিরিক্ত প্রিম্যাচিওর বা কম ওজনের হয় সেক্ষেত্রে এনআইসিইউ সুবিধাযুক্ত হাসপাতাল হলে আরও ভালো।
• যদি আগের বাচ্চার অতিরিক্ত জন্ডিসের ইতিহাস থাকে বা এই বাচ্চার অতিরিক্ত জন্ডিসের সম্ভাবনা আছে (যেমন মার ব্লাড গ্রুপ O+ বা Rh নেগেটিভ) সেক্ষেত্রে এসএনসিইউ যুক্ত হাসপাতাল প্রসব করানোর জন্য শ্রেয়।
• যদি আপনার শিশু জন্মের আগেই কোনোভাবে জেনে থাকেন যে তার বড়ো ধরনের জন্মগত ত্রুটি আছে তাহলে তৃতীয় পর্যায়ে রেফারেল হাসপাতালে প্রসব করানো উচিত।

তবে উপরোক্ত ক্ষেত্রগুলোতে নিয়মিত ডাক্তারের পরামর্শে থাকলে তারাই আপনাকে নিকটবর্তী সঠিক স্থানে পাঠাতে পারেন।

মূল সমস্যাটা তৈরি হয় যখন সিদ্ধান্তটা প্রাথমিকভাবে আপনাকে নিতে হয়। মানে বাচ্চা জন্মের পর হাসপাতাল থেকে বাড়িতে গিয়ে কয়েকদিন পর অসুস্থ হয়ে পড়লে। সমস্যা হয় দেরিতে শনাক্তকরণ ও দেরিতে হাসপাতাল পৌঁছোনোয়। সেক্ষেত্রে কিছু পরামর্শ আপনাকে সাহায্য করতে পারে। নবজাতকের অসুস্থতার বৈশিষ্ট্যগুলো আপনাকে একটু মনে রাখতে হবে যেমন—

• খেতে না চাওয়া।
• ঝিমিয়ে/নেতিয়ে পড়া।
• পা ঠান্ডা হয়ে যাওয়া।
• শরীরের বর্ণ পরিবর্তন হওয়া ফ্যাকাসে/নীলাভ/ছোপছোপ।
• খিঁচুনি হওয়া। সদ্যোজাতকের খিঁচুনি কিন্তু বয়স্কদের তুলনায় অনেকটাই আলাদা। যেমন চোখ স্থির হয়ে যাওয়া, মুখ থেকে ফেনা বেরোনো বা অনবরত দুধ খাওয়ার মতো ঠোঁট সঞ্চালন, কোনো একটি হাত বা পা হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্য শক্ত হয়ে যাওয়া বা অস্বাভাবিক উচ্চস্বরে কান্না।
• শ্বাস কষ্ট হওয়া।
• শ্বাস বন্ধ হওয়া (প্রিম্যাচিওর বাচ্চাদের সংক্রমণের একটা অন্যতম প্রধান লক্ষণ হল হঠাৎ হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্য শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া)
• রক্তপাত হলে
• পেট ফুলে গেলে
• জন্ডিস যা হাত ও পায়ের তালুতেও দেখা যাচ্ছে।

এই সমস্ত ক্ষেত্রে এসএনসিইউ/এনআইসিইউ সুবিধাযুক্ত হাসপাতালই হওয়া উচিত আপনার গন্তব্য। তবে অবশ্যই যদি সেগুলিতে পৌঁছোনো সময়সাধ্য ব্যাপার হয় তবে নিকটবর্তী যে স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালে পাবেন আপনার প্রাথমিক গন্তব্য হওয়া উচিত।

নবজাত বাচ্চাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় কিছু কথা মনে রাখবেন—

• যেমন ভালো করে কাপড়ে মুড়ে আনবেন যেন সে ঠান্ডা না হয়ে যায়।
• নাক যেন কাপড়ে ঢাকা না পড়ে।
• শ্বাসকষ্ট হলে বা খিঁচুনি হলে বা ঝিমিয়ে থাকলে জোর করে খাওয়নোর চেষ্টা করবেন না।
• শ্বাস থেমে গেলে পায়ের তলায় হালকা টোকা মারুন।

. . . .

এ পর্যন্ত সব আলোচনাটাই ছিল নবজাতকের যত্ন নিয়ে। এবার আসা যাক কখন আপনার বাচ্চার পিকুর পরিষেবা দরকার তা নিয়ে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে পিকু-তে ভর্তি নির্ভর করে বাচ্চার অসুখের তীব্রতার ওপর। মেনিনজাইটিস, নিওমোনিয়া, লিভারের ফেলিওর, এনকেফেলাইটিস, অ্যাজমা প্রায় প্রতিটি রোগেই অসুখের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে সাধারণ ওয়ার্ডে বা এইচডিইউ-তে, পিকু-তে চিকিৎসা করা যেতে পারে। যদি বাচ্চা—

- অচেতন হয় বা ঠিকঠাক সারা না দেয়।
- অতিরিক্ত শ্বাসকষ্টের লক্ষণ থাকে।
- আগে থেকেই কোনো রোগে আক্রান্ত থাকে, যেমন জন্মগত হৃদ্‌যন্ত্রের ত্রুটি।
- খিঁচুনি হয়।
- রক্ত সংবহন ঠিকমতো না হয়, যেমন হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যাওয়া, অনেকক্ষণ প্রস্রাব না হওয়া।

এই সমস্ত ক্ষেত্রে পিকু সুবিধাসম্পন্ন সমগ্র হাসপাতালেই যাওয়া উচিত।

শেষ প্রশ্ন: কোথায় যাবেন?

কী ভাবছেন? আপৎকালে সিদ্ধান্ত যদি নিজেই নিতে হয় তো কোথায় যাবেন? স্পষ্ট সোজা উত্তর দেবার রাস্তা নেই। ভাবছেন সরকারি ব্যবস্থায়, সরকারি মেডিক্যাল কলেজে নানা গণ্ডগোল, আর প্রাইভেট হাসপাতালেও তো 'নিকু' 'পিকু' আছে, সেখানে সব ঠিক আছে? কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ২০১৫-এর নভেম্বর মাসে ওয়ার্মারে দুই শিশুর 'পুড়ে' মারা যাওয়াটা সরকারি ব্যবস্থা নিয়ে আরও বেশি উদ্বিগ্ন করে তুলেছে আপনাকে? প্রাইভেট হাসপাতালেও সব ঠিক আছে তা কিন্তু নয়। সব প্রাইভেট হাসপাতাল একই মানের নয়। তাদের অনেকগুলোই বেশ কম গুণমানের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্স দিয়ে চলে, আর স্পেশালাইজড এইসব ইউনিট চালানোর মতো নার্স খুব কম আছেন। ডাক্তারের কথা যদি ছেড়েও দিই, কেবল এই কারণেই সেখানে বিপত্তি হতে পারে, বিপত্তি হয়ও। কিন্তু ঠান্ডা কাচের ঘরের দরজার আড়াল থাকায় লোক-জানাজানি কম হয়।

শেষ কথা হল, সরকারি হাসপাতালে গেলে অন্তত ধনে-প্রাণে মরার সম্ভাবনা কম, এবং সেখানে চিকিৎসা পাওয়াটা আপনার অধিকারও বটে। একটু দেখে বুঝে যাবার চেষ্টা করুন, ব্যবস্থাটা সম্পর্কে এখানে যথাসাধ্য বললাম, সেই ধারণাটাও হয়তো খানিক কাজে লাগতে পারে আপৎকালে। বেসরকারি হাসপাতালে কোথাও ভালো কাজ হয় না, সেটা কিন্তু নয়। বাইরের চাকচিক্য না দেখে, অন্য রোগীর মা-বাবার অভিজ্ঞতা কী বলছেন, সেটা শুনেবুঝে সিদ্ধান্ত নিন। যদি আপনার কাছের কোনো ডাক্তারবাবু, বিশেষ করে শিশুবিশেষজ্ঞ থাকেন তো তিনি হয়তো সৎ পরামর্শ দিতে পারবেন। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. সব্যসাচী পাণ্ডে, এমবিবিএস, এমডি, শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ।
এক সরকারি হাসপাতালে কর্মরত।

নবজাতকের মৃত্যু: দায়ী কে?

ডা. অনীক চক্রবর্তী

সিরিয়া থেকে মেডিক্যাল কলেজ—শিশুরা যখন হোক, যেখানেই হোক নিথর দেহ নিয়ে পড়ে থাকলে আমরা নড়েচড়ে বসি। এ পৃথিবীর ভালো- খারাপ- আলো-আঁধারগুলো বুঝে ওঠার আগেই একটা জীবন ঝরে গেল বা বলা ভালো, যেতে বাধ্য হল ---এ আমাদের কেমন যেন সভ্যতার ভরা কোর্টরুমে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দেয়। তাই বছর পঞ্চাশের একটা মানুষের পুড়ে যাওয়া আর দিন কয়েকের একটা শিশুর পুড়ে যাওয়া অঙ্কের হিসেবে এক হলেও সভ্যতার হিসেবে, মানবিকতার হিসেবে বা বোঝাপড়ার হিসেবে কিছুতেই এক নয়। তাই মেডিক্যাল কলেজে যখন দুই সদ্যোজাতর মৃত্যুর খবর হয়, তা একটু বেশি 'সেন্সিটিভ' হয়ে ওঠে, একটু বেশিই 'খবর' হয়ে ওঠে এবং আমাদেরও তার বিভিন্ন দিকগুলিকে টেবিলে রেখে কাটাছেঁড়া করার দরকার হয়ে পড়ে। বছর পঞ্চাশের গড়পড়তা কেউ একজন পুড়ে গেলে সেটা অবশ্যই খবর হত, 'গাফিলতি'ও হত, কিন্তু 'সেন্সিটিভ ইস্যু' হত না কিছুতেই। আমরাও দাবার বোর্ডে অতি সাবধানী হয়ে বোড়ে এগোতাম না। যাই হোক, মূল আলোচনায় ঢোকার আগে শুধুমাত্র শিশুরাই কেন আমাদের 'সেন্সিটিভিটি'র তাস হবে সেই বিতর্কটা একটু তুলে দিয়ে গেলাম আর কি . . .

অতঃপর নভেম্বর। বিপ্লবের মাস হিসেবে ডাইরিতে টুকে রেখেছি কি রাখিনি হঠাৎ হাওয়ায় ছড়াল সদ্যোজাতর পোড়া গন্ধ। গত ২৪শে নভেম্বর মেডিক্যাল কলেজে শিশু বিভাগের ওল্ড নার্সারিতে দু-জন সদ্যোজাত ওয়ার্মারে পুড়ে মারা যায়। শুধু এইটুকুই খবর। এর কোনো ল্যাজা নেই মুড়ো নেই। দৈনিকে যা হেডলাইন, টিভিতে যা ব্রেকিং নিউজ—ঘটনা শুধুমাত্র সেটুকুই। তারপর গণভিলেন তকমা পাওয়া ডাক্তার আর নার্সকে হালকা ভেজে জনতার প্লেটে গরম গরম সার্ভ করে দাও—দায়িত্ব শেষ, গল্প খতম। ব্যস, বাতাস আবার ছোটে নতুন খবরের খোঁজে, নতুন খাবারের খোঁজে।

ওয়ার্মার কী এবং কেন সেটুকুর দিকে একটু তাকানো যাক। নির্দিষ্ট সময়ের আগে জন্মানো শিশু (premature baby) বা কম ওজন-বিশিষ্ট শিশুরা (low birth weight baby) শারীরিক কারণেই নিজস্ব উষ্ণতা বজায় রাখতে পারে না। ফলে তাদের শারীরিক তাপমাত্রা কম হয়ে যাওয়ার (hypothermia) ভয় থাকে। (পাশাপাশি তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও কিছুটা কম হওয়ার সম্ভাবনা তো থাকেই)। ওয়ার্মার যন্ত্রটি শিশুকে ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচায়। এতে থাকে একটি প্রোব যা ওয়ার্মারে রাখা শিশুর চামড়ার সঙ্গে লাগানো থাকে। এই প্রোব শিশুটির শরীরের উষ্ণতা অনুভব করে এবং সেই অনুযায়ী যন্ত্র থেকে প্রয়োজনীয় তাপ বিকিরিত হয়। বিজ্ঞান যেহেতু রজনীকান্ত নয় তাই যুক্তিসঙ্গত কারণেই একটি ওয়ার্মারের একটিই প্রোব এবং তাতে একজন মাত্র শিশুকেই রাখা যায়। এবং অবশ্যই, স্বাস্থ্যব্যবস্থা যেহেতু একাধারে জগন্নাথ এবং অন্যধারে গান্ধারী তাই সরকারি হাসপাতালের একটি ওয়ার্মারে তিনটি, চারটি বা কখনো কখনো হাফ ডজন শিশুকে রাখা হয়। সেই রাতে মেডিক্যালের ওল্ড নার্সারিতে ছিল আঠাশটি শিশু এবং তার প্রায় এক তৃতীয়াংশ ওয়ার্মার। ফলে গাণিতিক নিয়মেই অভিশপ্ত ওয়ার্মারটিতে ছিল তিনটি শিশু। ঘটনাটি ঘটে যখন প্রোব-লাগানো শিশুটির মা প্রোবটি খুলে তাকে নিয়ে দুধ খাওয়াতে ওয়ার্ডে চলে যান। খোলা প্রোবে অনুভূত হতে থাকে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরের উষ্ণতা এবং সেই অনুযায়ী অতিরিক্ত তাপ বিকিরিত হতে থাকে। চড়চড় করে বেড়ে যায় ওয়ার্মারের উষ্ণতা এবং পুড়ে যায় দু-টি শিশুসহ আমাদের মুখগুলো।

নিঃসন্দেহে দুঃখজনক ঘটনা। কিন্তু তারপরে ঘটনাক্রম এগোলো কীভাবে? না, শিশুবিভাগের প্রধান, আরএমও এবং সিস্টার-ইন-চার্জের বদলি এবং শিশুবিভাগের তিন পিজিটি একমাস করে সাসপেন্ড হলেন; আর অনির্দিষ্টকালের জন্য সাসপেন্ড হলেন সেই রাত্রে ওয়ার্ডে থাকা সিস্টার। কিন্তু এই প্রেক্ষাপটে মেডিক্যাল কলেজে শিশু বিভাগের মূল ওয়ার্ড থেকে ওল্ড নার্সারির দূরত্ব কতটা, কেনই-বা এতটা দুরত্বে থাকা ওল্ড নার্সারিটি পিজিটিদের যৌক্তিক বিরোধিতা সত্ত্বেও শিশুবিভাগের প্রধান চালু রেখেছিলেন সেই প্রশ্নগুলো উঠল না। প্রশ্ন উঠল না আঠাশজন সদ্যোজাতর দেখভালের জন্য সেই রাত্রে মাত্র একজন সিস্টার কেন ছিলেন। এই চরম অনভিপ্রেত 'অ্যাক্সিডেন্ট' না ঘটার জন্য এবং ভবিষ্যতে আটকানোর জন্য যে যে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের প্রয়োজন, ডাক্তার এবং নার্স নিয়োগ প্রয়োজন তা উঠল না আলোচনায়। আর উঠবেই বা কীভাবে? স্বাস্থ্যের সার্কাস এরিনায় পরিচিত রিংমাস্টার নির্মল মাজি যদি সর্বক্ষণ অধ্যক্ষের ঘরে বসে নিজের খামখেয়ালিপনা আর বিচারবুদ্ধিতে শুধুমাত্র 'ড্যামেজ

কন্ট্রোল'-এর চেষ্টা চালিয়ে যান তা হলে একটি দুর্ঘটনা—তার কারণ তাতে করণীয় বিষয়ে খুব আশা করার মতো কিছু উঠে না আসাটাই স্বাভাবিক। এবং শেষপাতে আগুপিছু কিচ্ছু না ভেবে মাননীয়া স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য তো আছেই—'ওরা তো খুনি। সাসপেন্ড করব না তো কি চুমু খাব?'

না, তাতে কোনো দিক থেকেই সমস্যার সমাধান হবে না মাননীয়া। আসলে এ কথা ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি মাখা বিজ্ঞাপনী মুখের মতোই পরিষ্কার যে ডাক্তাররা ভোটব্যাঙ্কের তলায় পড়ে থাকা অচল আধুলি। তাই সময়মতো তাদের উন্নয়নের মহাযজ্ঞে আহুতি দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা যায় আবার সময় ফুরিয়ে গেলেই টুক করে হাঁড়িকাঠে চড়িয়ে দেওয়া যায়। এবং অনবরত এই খেলা চলার ফলে যেটা হচ্ছে তা হল জনতার দরবারে সরকার এবং মিডিয়া দিয়ে ইতিমধ্যেই মোগাম্বো বনে যাওয়া ডাক্তাররা রোগীর সঙ্গে যেটুকু আত্মীয়তা অনুভব করার প্রয়োজনবোধ করতেন সেটুকুও আর করছেন না। এই তুমুল যান্ত্রিকতার যুগে অন্যান্য ক্ষেত্রগুলির তুলনায় স্বাস্থ্যক্ষেত্র অন্তত এখনও মানবিক স্পর্শে বেশি সম্পৃক্ত। যদিও স্বীকার করা ভালো, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ডাক্তাররাই নিজে উদ্যোগ নিয়ে অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা-ওষুধ দিয়ে, প্রয়োজনীয় কমিশন খেয়ে আর রোগীর প্রতি অসহনীয় খারাপ ব্যবহার করে ডাক্তার-রোগী সম্পর্ককে অবিশ্বাসের অলকানন্দায় ভাসিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তার পরেও সরকারের দায় অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই। স্বাস্থ্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা যা বিনামূল্যে প্রদানের দায় আছে সরকারের। পৃথিবীর বহু দেশ তার উদাহরণ। অথচ এ পোড়া দ্যাশে কী কেন্দ্র কী রাজ্য—কোনো সরকারই 'আলমা আটা'র নাম শুনেছে বলে বোধ হয় না। রাষ্ট্র আসলে কতটা গণকল্যাণকামী সে নিয়ে একগুচ্ছ সান্টা-বান্টা জোক বানানো যায়। ফলে স্বাস্থ্য পরিষেবা বিনামূল্যে ঘোষণা করার ছেলে-ভোলানো গল্পটায় আপাতত আর ভুলে থাকা যাচ্ছে না মাননীয়া বিশ্বাস করুন। এখানে স্বাস্থ্য হল ভোট কেনার টেক্কা আর তাতে মুড়ি-মুড়কির মতো প্রতিশ্রুতি আসলে জনতার নতমস্তকে টুপি পড়িয়ে সাধের সিংহাসনটিতে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকার ছক। তাই জাদুকাঠির ছোঁয়ায় মহকুমা হাসপাতাল হয়ে যায় জেলা হাসপাতাল, জেলা হাসপাতাল হয়ে যায় মেডিক্যাল কলেজ, মেডিক্যাল কলেজগুলিতে একের পর এক গড়ে ওঠে গগনচুম্বী ইমারত, কোটি টাকা ঢেলে তৈরি হয় সুদৃশ্য তোরণ আর অবশেষে জরুরি বিভাগের মেঝেতে পড়ে থাকা রোগীর আর্তনাদ পাক খেয়ে মিশে যায় উন্নয়নের বাতাসে।

এর মাঝে জুনিয়র ডাক্তাররা? মেডিক্যাল কলেজগুলিতে পরিষেবা বাঁচিয়ে রাখেন মূলত তারাই। সপ্তাহে ডিউটি কিন্তু গড়ে এক-শো ঘণ্টার ওপরে; একগুচ্ছ 'নেই'-এর সাঁড়াশি পরিস্থিতির মধ্যে। বিনামূল্যে সমস্ত ওষুধ পাওয়া যাবে—-এই সরকারি ঘোষণা হয়ে যাওয়ার পর যদি হাসপাতালের ফার্মাসিকে কার্যত পঙ্গু করে রাখা হয়, ওয়ার্ডে সাধারণ প্রয়োজনীয় ওষুধ তো দূর অস্ত সামান্য গজ-তুলো পাওয়াও মুশকিল হয়ে পড়ে এবং স্বাস্থ্য বাজেটে বরাদ্দ কমিয়ে হু হু করে দাম বাড়িয়ে দেওয়া হয় জীবনদায়ী ওষুধের—তা হলে এই সরকারি দ্বিচারিতার দায় বইতে হয় ডাক্তারকেই। যেহেতু সাধারণ মানুষ নিজেদের হাতের সামনে পায় ডাক্তারদেরকেই। এবং একটা ভগ্ন পিরামিড সিস্টেমের ভেতরে ঘটা একটা দুর্ঘটনাকে খুব সহজেই কোনো এক ব্যক্তি ডাক্তার/নার্সের গাফিলতি বলে দেগে দেওয়াটাও আসলে সরকারের নিজের দায় ও দায়িত্ব থেকে হাত ঝেড়ে ফেলারই নামান্তর।

পাঠক, অবশেষে একটা ছোট্ট কথা। স্বাস্থ্য আপনার অধিকার। সরকারের ভোট এবং কর্পোরেটের ব্যাবসা করার জিনিস নয়। অনেক ডাক্তারই কিন্তু আজও স্বপ্ন দেখেন মানুষের জন্য ডাক্তারিটা করার। তাদের এককভাবে কাঠগড়ায় তুলে সেই স্বপ্নগুলো না ভেঙে আসুন সরকারকে বাধ্য করি আমাদের স্বাস্থ্যের, জীবনের আরও দায় নিতে। অবহেলায় মানুষ পুড়ে গেলে সে দায় সামাজিকভাবে সবারই। **স্বাস্থ্যের বৃত্তে**

ডা. অনীক চক্রবর্তী, এম বি বি এস, একটি বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। যুক্ত আছেন শ্রমজীবী মানুষের জন্য চলা এক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে।

Advt.

ধর্ম-জাতপাত-অযুক্তি-কর্তৃত্ব ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আপনার যুক্তিবাদী মননচর্চার দীর্ঘদিনের সাথী

একুশ শতকের যুক্তিবাদী

একুশ শতকের যুক্তিবাদী

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির কেন্দ্রীয় মুখপত্র

৩১, প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন, বরানগর, কলকাতা - ৭০০ ০৩৬

যোগাযোগ: ৯৮৩৬৪৭৭১৯৫, ৯৮৩০৬৭৩৫১২

এছাড়া কমবয়সীদের জন্য আছে আকর্ষণীয় গল্প-ফিচার-ছবিতে ঠাসা কিশোর যুক্তিবাদী

মেডিক্যাল কলেজে শিশু-মৃত্যু: সম্পাদকীয় তদন্ত

নভেম্বর ২১, ২০১৫-এ মেডিক্যাল কলেজের সিক নিওনেটাল কেয়ার ইউনিট (এসএনসিইউ)-এ দু-জন শিশু যে ওয়ার্মারে ছিল সেটি অতিরিক্ত গরম হওয়ার জন্য মারা যায়। তারা দু-জন জন্ম-পরবর্তী জন্ডিসে ভুগছিল, তৃতীয় আরেকজন শিশুর সঙ্গে তাদের রাখা ছিল একই রেডিয়ান্ট ওয়ার্মারের তলায়। ওয়ার্মারের প্রোব (অর্থাৎ যেটা গায়ে লাগানো থাকলে শরীরের তাপমাত্রা বুঝে যন্ত্র চালু হয় ও গরম করে, অথবা বন্ধ থাকে) লাগানো ছিল তৃতীয় একটি শিশুর গায়ে। তার মা নিজের শিশুকে দুধ খাওয়াতে নিয়ে যান, ও গায়ে-লাগানো প্রোবটি খুলে রাখেন। প্রোব না লাগানো বাকি দু-জন পড়ে থাকে। প্রোব কোনো শিশুর গায়ে না লাগানো থাকায় তাপমাত্রা মেশিন কম বলে দেখে, ও সেটি চলতে থাকে। দু-জন অতিরিক্ত গরম হবার জন্য, বা সংবাদপত্রের ভাষায় বলতে গেলে, ‘পুড়ে’ মারা যায়। স্বভাবতই শিশুর অভিভাবকরা ডাক্তার ও নার্সদের গাফিলতির অভিযোগ এনে তাঁদের শাস্তির দাবি তোলেন।

সরকারি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়—দ্রুত কমিটি তার সুপারিশ জানায় ও সুপারিশ কার্যকর হয়। শিশু বিভাগের প্রধান ডা. তাপস সাবুই, শিশু বিভাগের আরএমও ডা. সুশান্ত ভঞ্জ, এসএনসিইউ-র সিস্টার-ইন-চার্জ শ্রাবণী পাল, হাসপাতালের নার্সিং সুপারিনটেন্ডেন্ট কেয়া সামন্ত এবং ডেপুটি নার্সিং সুপারিনটেন্ডেন্ট ইন্দ্রাণী দাসকে আর জি কর মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়। আসল শাস্তি নামে তিন এমডি ছাত্রী ডা. রোশনী চক্রবর্তী, মালবিকা মাইতি ও সুস্মিতা ব্যানার্জী এবং সেই সময় যিনি ডিউটিতে ছিলেন সেই নার্স চন্দ্রাণী দে-র ওপর। প্রথম তিনজনকে একমাস এবং নার্সকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য সাসপেন্ড করা হয়। এই শাস্তিতে খুশি নন শাসক দলেরই ক্ষমতাবান কেউ কেউ। তাই দ্বিতীয় তদন্ত কমিটি বসেছে।

পাশাপাশি *স্বাস্থের বৃত্তে*-র সম্পাদকীয় দলও চালিয়েছে নিজস্ব তদন্ত, এই তার রিপোর্ট।

মেডিক্যাল কলেজের শিশুরোগ বিভাগ দুই নম্বর গেটের কাছে এমার্জেন্সি বিল্ডিং-এর দোতলা-তিনতলাতে হলেও এসএনসিইউ তার চেয়ে বেশ অনেকটা দূরে স্ত্রীরোগ ও ধাত্রীবিদ্যার বিল্ডিং ইডেনে অবস্থিত।

এসএনসিইউ-র বিভিন্ন বিভাগ ও তার বেড ও রোগী-সংখ্যা দেখুন নীচের সারণিতে।

বিভাগ	শয্যা সংখ্যা	গড়ে ভর্তি রোগীর সংখ্যা
PICU বা পেডিয়াট্রিক ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিট	বেড-৯	বেডে ১ জন করে মোট ৯
	কট-২	কটে ১/২ করে মোট ২-৪; সর্বমোট ১১-১৩ জন।
NICU (1) নিওনেটাল ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিট ১	১৩	১৩
NICU (2) নিওনেটাল ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিট ২	১৭	১৭
SNCU বা সিক নিওনেটাল কেয়ার ইউনিট	২১	৫২
Step Down	১২	২৮
Out Born	১৫	৩২
Old Nursery	৯	২৮
মোট	৯৮	১৮১-১৮৩

ডাক্তার ও নার্সের সংখ্যা বিভিন্ন বিভাগে দেখুন ১৬ পাতার সারণিতে।

পশ্চিমবঙ্গের ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট আইন অনুযায়ী আইসিসিইউ/ আইটিইউ/আইসিইউ-তে কতজন ডাক্তার ও নার্স থাকার কথা, দেখা যাক।

ডাক্তার	নার্স
১০ জন রোগী পিছু ১ জন	৪ জন রোগী পিছু ১ জন

এই হিসাব থেকে পরিষ্কার যে, মেডিক্যাল কলেজের এসএনসিইউ-তে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম ডাক্তার ও নার্স আছেন।

এক শিশুরোগবিদ যিনি সম্প্রতি মেডিক্যাল কলেজ থেকে এমডি করেছেন, মেডিক্যাল কলেজে এসএনসিইউ উদ্বোধনের দিন থেকে পর-পর দুই বছর সেখানে কাজ করেছেন, তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার কথা আমাদের জানিয়েছেন।

দু-জন শিশু ‘পুড়ে’ মারা গেছে আউট-বর্ন নার্সারিতে। প্রথমে যে এসএনসিইউ তৈরি হয় এটা তার অতিরিক্ত। অবস্থান ইডেন বিল্ডিং-এর যে প্রান্তে মূল এসএনসিইউ, তার বিপরীত প্রান্তে। প্রশাসনের কাছে সে সময় ডাক্তাররা আপত্তি জানান যে একই সঙ্গে দুটো আলাদা জায়গায় একই কর্মী দিয়ে অসুস্থ শিশুদের চিকিৎসা করা অসুবিধাজনক। কিন্তু মেডিক্যাল কলেজের এসএনসিইউকে পশ্চিমবঙ্গের সর্ববৃহৎ এসএনসিইউ করার ঘোষণাকে কার্যকর করতে এসব আপত্তি অগ্রাহ্য করা হয়।

আপাত কম অসুস্থ শিশুদের এই ওয়ার্ডে ভর্তি রাখা হয়—ঠিক ওজনের নবজাতক যাদের জন্ডিসের জন্য আলোক-চিকিৎসা (phototherapy) চলছে; যে সব শিশু অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল, এখন সুস্থ কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিকের কোর্স পুরো করার জন্য যাদের রাখা দরকার; সুস্থ শিশু যাদের মায়েরা অসুস্থ। গড়ে ২০-৩০ জন নবজাতক ভর্তি থাকে এই ওয়ার্ডে। তাদের দায়িত্বে রাতে থাকেন একজন নার্স (মনে রাখুন ৪ জন পিছু ১ জন থাকার কথা)। এই বাচ্চারা demand feed-এ থাকে, অর্থাৎ খিদে পেয়ে কাঁদলে তাদের দুধ দেওয়া হয়। বাচ্চাদের জন্য দুধ তৈরি করা,

খাওয়ানো, অন্যান্য যত্ন নেওয়া, রেকর্ড রাখা—সবই করতে হয় এই একজনকেই। স্নাতকোত্তর পাঠরত/রতা ডাক্তাররা কেবল সকালে রাউন্ড দেওয়া এবং সন্ধ্যায় ছুটি লেখার দায়িত্বে।

আসল সমস্যাটা হয় রাতে। রাত ১০টা থেকে সকাল ৬টা অবধি মায়েদের ওয়ার্ডে ঢুকতে দেওয়া হয় না। একজন মাত্র নার্সকে তখন ৩ ঘণ্টা ছাড়া ২০-৩০ জন নবজাতককে খাওয়াতে হয়। তাতে একেকবারে সময় লাগে ২ ঘণ্টা, মাঝের ১ ঘণ্টার বেশ কিছুটা সময় যায় দুধ তৈরি করতে।

এমন অবস্থায় নার্সকে গাফিলতির জন্য দায়ী করা যায় কি? নাকি দায়ী তাঁরা যাঁরা পরিকাঠামো তৈরি না করেই ওয়ার্ড খুলে দেন? আর ডাক্তাররা তো ওখানে ডিউটিতেই ছিলেন না, তাঁদের ঘাড়ে শিশুমৃত্যুর দায় চাপিয়ে সাসপেন্ড করা যায় কি?

এবার আসি রেডিয়ান্ট ওয়ার্মারের প্রশ্নে। একটা ওয়ার্মারে একজন শিশুর থাকার কথা। তাতে একটাই সেন্সর (sensor) বা প্রোব থাকে, যা লাগানো থাকার কথা শিশুর গায়ে। গায়ের তাপমাত্রা কম হয়ে গেলে সেন্সর তা অনুভব করে ওয়ার্মার চালাবে, শিশু গরম হবে। আবার তাপমাত্রা বেড়ে গেলে সেন্সর তা অনুভব করে ওয়ার্মারকে বন্ধ করে দেবে। মেডিক্যাল কলেজের ঘটনায় যে শিশুর গায়ে সেন্সর লাগানো ছিল তার মা বাচ্চাকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ায় সেন্সর খালি পড়ে থাকে, কম তাপমাত্রা অনুভব করে ওয়ার্মারকে চালায় বাকি দু-জন 'পুড়ে' মারা যায়। একাধিক শিশু ওয়ার্মারে থাকলে এ রকম বিপদ সেন্সর বা প্রোব লাগানো বাচ্চাকে সরিয়ে না নিলেও অন্যভাবেও হতে পারে। যার গায়ে সেন্সর লাগানো তার তাপমাত্রা কম, অন্যদের স্বাভাবিক, তাহলে ওয়ার্মার চলবে; তাতে প্রথমজনের লাভ হবে, কিন্তু অন্যদের তাপমাত্রা বেড়ে গিয়ে ক্ষতি হবে। আবার তার তাপমাত্রা স্বাভাবিক বা বেশি, তাহলে ওয়ার্মার চলবে না, অন্য শিশুদের শরীরের তাপমাত্রা কম হলেও তারা রেডিয়েন্ট ওয়ার্মারে থাকার সুফল পাবে না। এক ওয়ার্মারে একাধিক শিশুকে রাখার জন্যও ডাক্তার বা নার্সদের দায়ী করা যায় কি?

এমন অবস্থায় নার্সকে গাফিলতির জন্য দায়ী করা যায় কি? নাকি দায়ী তাঁরা যাঁরা পরিকাঠামো তৈরি না করেই ওয়ার্ড খুলে দেন?

আজ থেকে অনেকদিন আগেই অক্টোবর-নভেম্বর, ২০১৪-র *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* পত্রিকায় সম্পাদক 'পশ্চিমবঙ্গের সরকারি চিকিৎসা পরিষেবা ঘোষণা ও বাস্তব' শীর্ষক এক প্রবন্ধ লেখেন। সেখানে পশ্চিমবঙ্গের এক মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের এসএনসিইউ-তে শিশুদের ঠান্ডা হয়ে বা পুড়ে মারা যাওয়ার কথা বলা হয়েছিল। কলেজটা বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ। আজ কলকাতার বুকে এশিয়ার সবচেয়ে প্রাচীন মেডিক্যাল কলেজে এই ঘটনা ঘটার জন্যই এত নাড়াচাড়া।

ডাক্তার, নার্স বা অন্য কোনো স্তরের চিকিৎসাকর্মীদের নিজেদের রোগীর প্রতি দায়বদ্ধ অবশ্যই থাকতে হবে, কোনো গাফিলতিই সেখানে দেখানো চলতে পারে না। কিন্তু প্রশাসকদের জনমোহিনী ঘোষণা এবং তদনুযায়ী পরিকাঠামো না বানানোর দায়িত্ব কেন তাঁদের নিতে হবে? স্বাস্থ্যের বৃত্তে

Advt.

KLOSTER Pharmaceuticals

B/13/H/3, Braunfeld Road, Kolkata-700 027,
Phone : 033 2449-0144, Mob.: 98306 63724
E-mail : kloster_pharma@yahoo.co.in
Website : klosterpharma.com

<table>
<tr><th>বিভাগ</th><th>নার্স</th><th>ইন্টার্ন</th><th>এমডি ছাত্রছাত্রী</th><th>আরএমও</th></tr>
<tr><td>PICU</td><td>সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টো—৩/৪ জন। দুপুর ২টো থেকে রাত ৮টা—৩/৪ জন। রাত ৮টা থেকে সকাল ৮টা—২ জন।</td><td>১ জন ২৪ ঘণ্টা ডিউটি দেন</td><td>সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা—এমডি প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের ১ জন করে মোট ৩ জন। রাত ৯টা থেকে দ্বিতীয় বা তৃতীয় বর্ষের ১ জন।</td><td rowspan="7">সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা অবধি একজন আরএমও এসএনসিইউ -র জন্য থাকেন। সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা অবধি ১ জন আরএমও পুরো শিশু রোগ বিভাগের জন্য থাকেন। হাসপাতাল প্রাঙ্গণের একপ্রান্তে ২ নং গেটের কাছে শিশুর নিবাস মেডিক্যাল। অন্যপ্রান্তে ইডেন বিল্ডিং-এ অবস্থিত এসএনসিইউ। দুই-এরই দায়িত্বে তিনি।</td></tr>
<tr><td>NICU(1)</td><td>সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টো—১ জন। দুপুর ২টো থেকে রাত ৮টা—১ জন। রাত ৮টা থেকে সকাল ৮টা—১ জন।</td><td rowspan="5">NICU, SNCU, Step Down, Out Born, সব মিলিয়ে সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টো-—২ জন। দুপুর ২টো থেকে রাত ৯টা—১জন রাতে কেউ না।</td><td rowspan="5">NICU, SNCU, Step Down, Out Born, সব মিলিয়ে সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা এমডি প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের ২ জন করে মোট ৬ জন।
রাত ৯টা থেকে পর দিন দুপুর ২টো পর্যন্ত এমডি প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের ১ জন করে মোট ৩ জন।
রাতে যাঁদের ডিউটি থাকে তাঁরা সকাল ৮টায় হ্যান্ড-ওভার দেন। কিন্তু রাউন্ড শেষে ডিউটি ছাড়তে ২টো বাজে।</td></tr>
<tr><td>NICU(2)</td><td>সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টো—১ জন। দুপুর ২টো থেকে রাত ৮টা—১ জন। রাত ৮টা থেকে সকাল ৮টা—১জন।</td></tr>
<tr><td>SNCU</td><td>সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টো—২ জন। দুপুর ২টো থেকে রাত ৮টা—২ জন। রাত ৮টা থেকে সকাল ৮টা—১জন।</td></tr>
<tr><td>Step Down</td><td>সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টো—২ জন। দুপুর ২টো থেকে রাত ৮টা- ২ জন। রাত ৮টা থেকে সকাল ৮টা—১ জন।</td></tr>
<tr><td>Out Born</td><td>সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টো—১ জন। দুপুর ২টো থেকে রাত ৮টা—১ জন। রাত ৮টা থেকে সকাল ৮টা—১ জন।</td></tr>
<tr><td>Old Nursery</td><td>সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টো—১ জন। দুপুর ২টো থেকে রাত ৮টা—১ জন। রাত ৮টা থেকে সকাল ৮টা—১জন।</td><td>কারোর ডিউটি ছিল না। ঘটনার পর থেকে ২৪ ঘণ্টার জন্য ১ জন।</td><td>কারোর ডিউটি থাকে না। প্রয়োজনে নার্স ফোন করে এসএনসিইউ থেকে ডেকে নেন।</td></tr>
</table>

একটি কেস স্টাডি

ডা. তুহিন রায়

একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই *স্বাস্থ্যের বৃত্তে*-র পাতায় এই লেখা। এক ভদ্রলোককে আমি জিজ্ঞাসা করি 'কী ব্যাপার অনেক দিন দেখা হয়নি!' হঠাৎ উনি খুব আবেগপ্রবণ হয়ে বললেন ''চিকিৎসা বিভ্রাটে, দু-বছর আমাদের পরিবারের সুখ ও শান্তি ছিনিয়ে নিয়েছিল। আমার মেয়ের কেরিয়ার নষ্ট হয়ে গেল।' আমার ঔৎসুক্য বাড়ল, বিস্তারিত জানতে চাইলাম। যা জানলাম তা এই কেস স্টাডিতে লিপিবদ্ধ করলাম।

ক্লাস ইলেভেনে পাঠরতা একটি মেয়ে। সে পড়াশোনায় যেমন ভালো তেমনি তার জীবনে এগিয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। মা ও বাবার সঙ্গে সে প্রথম এক ডাক্তারবাবুর কাছে যায়। সেই ডাক্তারবাবু তাকে এইচ. পাইলোরি-র (H. pylori) চিকিৎসা দেন। প্রসঙ্গত বলে রাখি এইচ পাইলোরি একটা জীবাণুর নাম যা পেপটিক আলসার (পাকস্থলী ও ডিওডিনামে ঘা) বা গ্যাসট্রাইটিস-এর ৯০ শতাংশর জন্য দায়ী। সাত দিন ওষুধ খেয়েও যখন কোনো উপশম হল না তখন সেই ডাক্তার তাকে আলট্রাসাউন্ড স্ক্যান করতে বললেন। তাতে ধরা পড়ল পিত্তথলিতে পাথর আছে। পিত্তথলি থেকে বেড়িয়ে আসা নালী (cystic duct) আর লিভার থেকে বেরিয়ে আসা নালী (common hepatic duct)-এর সংযোজনে তৈরি হয় কমন বাইল ডাক্ট (common bile duct) বা CBD, সেটি স্বাভাবিক ছিল।

ডাক্তারের পরামর্শমতো মেয়েটি একটি নার্সিংহোমে ভর্তি হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর সিদ্ধান্ত হয় যে ল্যাপারোস্কোপের সাহায্যে তার অপারেশন (Laparoscopic cholecystectomy) হবে। ছোটো তিনটি ফুটো করা হবে। সাত দিনের মধ্যে স্কুলে যেতে পারবে—এটা ভেবে অপারেশনের নামে ভয়ে শুকিয়ে গেলেও, একটা আশার আলো তাকে উদ্দীপ্ত করে তুলল। বাবা মা-ও আশা করলেন এইবার মেয়ে ভালো হয়ে যাবে, ও আবার তার গতিশীল জীবনে ফিরে যেতে পারবে।

যথারীতি অপারেশন হয়ে গেল, তিন দিন পরে মেয়েটি বাড়িও ফিরে এল। কিন্তু নার্সিংহোমে থাকাকালীনই মেয়েটি বলতে লাগল ''আমার কিন্তু ব্যথা কমেনি।'' নার্সিংহোমের ডাক্তারবাবু বললেন—ওই অপারেশনের পর একটু-আধটু ব্যথা থাকেই। শল্য-চিকিৎসক বললেন, ও গ্যাসের ব্যথা, অনেক ব্যথার ওষুধ খেয়েছে তো তারই ব্যথা।

বাড়িতে ফিরে এসে মেয়েটি মাঝেমাঝেই যন্ত্রণায় কাতর হয়ে যেত। মেয়েটিকে দু-টি কষ্ট সমানভাবে ব্যথিত করছিল। স্কুলে যেতে না পারার ও পড়াশোনায় পিছিয়ে যাওয়ার কষ্ট, আর তার থেকেও বেশি পেটের ব্যথা। পারিবারিক চিকিৎসকের কথা অনুযায়ী আবার সেই শল্যচিকিৎসকের কাছে উৎকণ্ঠিত মেয়েটি আর ততোধিক উৎকণ্ঠাগ্রস্ত মেয়ের মা-বাবা হাজির হন। উক্ত ডাক্তারের কাছে মেয়েটি বা তার বাবা-মা কোনো অভিযোগের সুরে কথা বলেননি। ডাক্তারবাবুই রেগে বলতে থাকলেন—অপারেশন নিখুঁত হয়েছে। আপনারা বিনা কারণে উতলা হচ্ছেন। ওষুধ লিখে দিচ্ছি ঠিক হয়ে যাবে। ডাক্তারবাবুর কড়া মেজাজে তাঁরা সন্ত্রস্ত হয়ে গেলেন। তাঁদের আবার আশার আলো দেখা ছাড়া উপায় ছিল না।

থেকে থেকে প্রচণ্ড ব্যথা আর নানা কারণে মনোকষ্ট মেয়েটি আর সহ্য করতে পারছিল না, সে বারে বারে তার বাবা-মাকে বলতে থাকে ''এই ভাবে বাঁচা যায় না।'' অগত্যা মেয়েটি তার বাবা-মায়ের সঙ্গে শহরে প্রতিষ্ঠিত আর একটি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুর কাছে যায়। তিনি আবার একটি আল্ট্রাসাউন্ড করতে বলেন, এখানেও উক্ত CBD (কমন বাইল ডাক্ট) স্বাভাবিক ছিল। ব্যস্ততম ডাক্তারবাবু গম্ভীরভাবে বললেন—ও কিছু না; অ্যান্টাসিড আর এনজাইম (pancreofast নামক ট্যাবলেট) দিয়ে বললেন, ঠিক হয়ে যাবে, ৬ সপ্তাহ পরে আসুন।

সুখ্যাত ডাক্তারবাবু, তাই অপেক্ষা করতেই হবে। আবার তারা আশায় বুক বাঁধলেন। কিন্তু রোগের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা না হলে যে ভালো ভালো মন রাখা কথায় কিছু যায় আসে না তা প্রমাণিত হল। ব্যথা কমল না। মেয়েটি না যেতে পারছিল স্কুলে, না দিতে পারছিল পরীক্ষা। বছর নষ্ট হল। বাবা-মায়ের মেয়েকে শুধু সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া আর কিছু করার ছিল না। বাবা ও মা আর্থিক আর মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেন।

শেষমেশ আর একটি মেডিসিন বিশেষজ্ঞকে দেখানো হল। তিনিও আগের আলট্রাসাউন্ড দেখলেন। তারপর রোগ নির্ণয় করার লক্ষ্যে তিনি আরও কতগুলি পরীক্ষা লিখে দিলেন। প্যাংক্রিয়াস (অগ্ন্যাশয়) ঠিক আছে কিনা দেখার জন্য Serum Amylase, Serum Lipase নামক রক্ত পরীক্ষা করালেন। পিঠের আর কোমরের শিরদাঁড়ার এক্স-রে করালেন (X-ray of Dorsal and Lumbar Spine)। তিনি বাবা ও মাকে বোঝালেন সব ওষুধ বন্ধ করে দিন। Prothiaden 75 একটি করে লিখে দিলেন। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি উক্ত ওষুধ মানসিক অবসাদের (anti-depressant) ওষুধ। অগত্যা তাই করলেন বাবা-মা।

ইতিমধ্যে শুরু থেকে দেখতে দেখতে দু-বছর কেটে গেল। সহপাঠিনীরা কেউ ডাক্তারিতে, কেউ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে, কেউ কমার্স লাইনে ভবিষ্যৎ সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার রাস্তা পেয়েছে, ওই মেয়েটি ঘুমোয় আর মাঝে মাঝে ব্যথায় কাতর হয়। পারিবারিক অর্থনৈতিক অবস্থা নড়বড়ে হয়ে ওঠে, মানসিক অবস্থা হয় আরও শোচনীয়। অসহায় বোধ থেকে মন্দিরে মন্দিরে নারকেল ফাটানো আর ওঝা-গুনিনদেরও শরণাপন্ন যে হয়নি মা ও বাবা তাও নয়।

অবশেষে অন্য শহরের একটি ডাক্তার তাদের মুক্তির পথ দেখান MRP [একটি বিশেষ Imaging প্রক্রিয়া] করানো হয়। কমন বাইল ডাক্টে পাথর ধরা পড়ে। বিশেষ পদ্ধতিতে (ERCP) করে পাথরটি বার করা হয়। মেয়েটি বর্তমানে সম্পূর্ণ সুস্থ। দু-বছরের খামতি-পূরণে সে উঠে পড়ে লেগেছে। শুরু করেছে নতুনভাবে জীবনটাকে গড়েপিটে নিতে। আমার বিশ্বাস সে পারবে। শুধু দু-টি প্রশ্নের উত্তর সে কোনোদিনও পাবে না। কেন এত কষ্ট পেলাম? কোথায় গেল আমার দু-বছর!

অতি সাধারণ কিন্তু খুবই সুলভ একটি 'কেস স্টাডি'। কিন্তু শিক্ষা

নেওয়ার অনেক কিছু আছে। কোন ডাক্তার কোথায় ভুল করেছেন তা প্রাসঙ্গিক হলেও অলোচনা করছি না। বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ও সম্মানিত পাঠকবর্গের উপর ছেড়ে দিলাম। কিন্তু চিকিৎসা জগতের সঙ্গে যারা যুক্ত আছেন তাঁদের মূল্যবোধ সম্বন্ধে একটু আলোচনা এড়ানো যায় না। ব্যথা নিয়ে যে মানুষ আসেন তারা শুধু 'পেশেন্ট' নন। তারা ব্যথিত মানুষ। তাই মানবিকতা বজায় রাখতেই হবে, প্রতিটি রোগীকে আপন ভাবতেই হবে, জ্ঞান দেওয়ার মতো শোনালেও এটাই বাস্তব। দায়িত্ব বেশি—তাই ডাক্তারি পেশা দায়িত্বশীলতার দাবি রাখে। অহমিকা বা অস্মিতা যাকে ইংরেজিতে 'ইগো' বলে তা যতটা সম্ভব কমিয়ে রাখা ভালো। আর এক বার ভেবে দেখতে অসুবিধেটা কোথায়? আর একটু যত্নশীল হওয়া যায় না? সব কথাই বহু আলোচিত। তবু একটু পুনঃচর্চা করার লক্ষ্যে এই কেস স্টাডির প্রচেষ্টা।

রোগী বা রোগীর আত্মীয়দেরও একটা অনুরোধ, ডাক্তারদের প্রশ্ন করুন, জানুন। এটা আপনার অধিকার আর ডাক্তারদের কর্তব্য। বিজ্ঞানমনস্ক ডাক্তার এতে অসহিষ্ণু হতে পারেন না। তারাও বিশ্বাস করেন 'to learn from the patient'—রোগীর কাছেই শিখতে হয়। চিকিৎসক আর ব্যথিত মানুষের মধ্যে একটি মানবিক যোগ গড়ে তোলার প্রচেষ্টাতেই *স্বাস্থ্যের বৃত্তে*-র পাতায় এই ''কেস স্টাডি''। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. তুহিন রায়, এমবিবিএস। ঝাড়খণ্ডের এক শহরে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

ডিসেম্বর ২০১৫-জানুয়ারি ২০১৬ সংখ্যায় ডা. পুণ্যব্রত গুণ লিখিত ''ডায়াবেটিস সম্পর্কে জানার কথা'' নিবন্ধে রক্তরস বা প্লাজমায় শর্করার মাত্রা কত হলে ডায়াবেটিস ধরা হবে তার একটা তালিকা দেওয়া হয়েছিল। *স্বাস্থ্যের বৃত্তে*-র পাঠক এক ডাক্তার জানালেন, আমেরিকান ডায়াবেটিস অ্যাসোসিয়েশন-এর নির্দেশিকাতে ডায়াবেটিস নির্ণায়ক পরীক্ষাগুলোর ফলাফল একটু অন্য বলে উল্লেখ আছে, আর ভারতের অধিকাংশ চিকিৎসকই এই নির্দেশিকা মেনে নেন। তাই আমেরিকান ডায়াবেটিস অ্যাসোসিয়েশন -এর ডায়াবেটিস-নির্ণায়ক মাত্রাগুলো এখানে দেওয়া হল।

আমেরিকান ডায়াবেটিস অ্যাসোসিয়েশন-এর ডায়াবেটিস-নির্ণায়ক পরীক্ষা

যেকোনো একটি মাত্রা অতিরিক্ত হলেই ডায়াবেটিস ধরতে হবে

হিমোগ্লোবিন A1C ৬.৫-এর সমান বা বেশি।	খালিপেটে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা ১২৬ মিগ্রা/লিটার বা বেশি।	৭৫ গ্রাম গ্লুকোজ খাবার ২ ঘণ্টা পরে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা ২০০ মিগ্রা/লিটার বা বেশি।	কোনো ব্যক্তির বেশি শর্করার চিরাচরিত লক্ষণগুলো থাকলে বা ডায়াবেটিসজনিত হঠাৎ-জটিলতা ক্লিনিক্যালি দেখা গেলে, রক্তে যেকোনো সময়ে করা গ্লুকোজের মাত্রা ২০০ মিগ্রা/লিটার বা বেশি।

Advt.

একক মাত্রা

গদ্য প্রবন্ধের এক আধুনিক ক্যানভাস

সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, মিডিয়া ও বিবিধ বিষয়ে এক অন্যতর গবেষণা ও আলোচনাপত্র

পাওয়া যাচ্ছে প্রায় সমস্ত স্টলে

গ্রাহক চাঁদা:১০০ টাকা (বার্ষিক), ২০০ টাকা (বার্ষিক), ২০০০ টাকা (আজীবন)

আজীবন গ্রাহকেরা পুরনো সংখ্যার একটি সেট বিনামূল্যে পাবেন

যোগাযোগ : ১৫০, মুক্তারাম বাবু স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০৭

দূরভাষ : ৯৮৩০২৩৬০৭৬ / ৯৮৩০৪৯৩২৩৯

খাদ্য দ্বারা সংক্রমণ ও ‘হু’-র পাঁচ চাবি

খাদ্য থেকে বহু রোগ-জীবাণু আমাদের আক্রমণ করতে পারে, তাদের নাম মনে রাখাই শক্ত। কিন্তু নিরাপদ খাদ্য গ্রহণ করে এদের সবাইকে আটকানো যায়, আর সেটা মোটেও শক্ত কাজ নয়—লিখেছেন ডা. নীহাররঞ্জন মণ্ডল।

শুক্রবার বিকেল, বর্ষাকাল। হাসপাতালে ডিউটি। ওয়ার্ডে গিয়েই দেখলাম আবালবৃদ্ধবনিতা জনা দশেক রোগী মেঝেতে শুয়ে। সবার হাতে লাগানো আছে স্যালাইনের নল। অতিরিক্ত রোগীর চাপে এঁদের বেডে দেওয়া যায়নি। সবাইয়ের রোগ একই, সবাইয়ের ওষুধও প্রায় একইরকম, বয়স ভেদে মাত্রা আলাদা। পাঠকদের নিশ্চয়ই খুব একটা কৌতূহল হচ্ছে না। কারণ রোগটা খুবই সাধারণ, নাম ‘আন্ত্রিক’। ওলাওঠা বা কলেরা; খাদ্যবিষণ বা Food Poisoning রোগেও এরকম বারবার পাতলা পায়খানা ও বমি হয়। এই রোগগুলি আরও জটিল হয় যদি এর সঙ্গে থাকে কৃমি বা আমাশয় বা জিয়ার্ডিয়া সংক্রমণ।

গত শীতের এক সকালে বহির্বিভাগে রোগী দেখছি। বাবা-মা দু-জনে বছর আটেকের এক ছেলেকে নিয়ে এসেছেন, তার গাল বেঁকে যাচ্ছিল। ছেলেটি গত একমাস যাবৎ যক্ষ্মা রোগের ওষুধ খাচ্ছে। তাদের অভিযোগ ওষুধ খাওয়াতেই ছেলের এসব হচ্ছে। ইতিহাস নিয়ে জানা গেল যে জ্বর ও খিঁচুনি নিয়ে সে বড়ো হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। সেখানেই তার রোগ নির্ণয় হয় ও তাদের সুপারিশ অনুযায়ী আমাদের হাসপাতাল থেকে টিবির ওষুধ দেওয়া শুরু হয়, যেহেতু সে এই এলাকার ছেলে। যাই হোক, এবার মাথার সি.টি.স্ক্যান করাতে কিছু ধরা পড়ল না। অতঃপর এম আর আই-তে ‘সিস্টিসারকোসিস’ ধরা পড়ে মস্তিষ্কের কোনো এক জায়গায়।

এই রোগের চিকিৎসা জটিল, মস্তিষ্কের অপারেশন করতে হতে পারে। সিস্টিসারকোসিস হয় গোরু বা শুয়োরের মাংস যথাযথভাবে সেদ্ধ না করে খেলে। বাচ্চাটি গো-মাংস খেত। ফলত, এই রোগ এবং মুখবিকৃতি। যথারীতি তাকে আবার বড়ো হাসপাতালে রেফার করা হল।

উল্লিখিত রোগগুলো জলবাহিত এবং খাদ্যবাহিত। এ ছাড়াও আছে টাইফয়েড বা প্যারাটাইফয়েড (বাংলায় ‘সান্নিপাতিক’ জ্বর); ভাইরাসঘটিত যকৃৎপ্রদাহ (হেপাটাইটিস-এ)—যে রোগে মুখে অরুচি, হলদে ‘ন্যাবা’ ও জ্বর হয়। আছে পোলিও মাইলাইটিসিস যাতে শৈশবেই পক্ষাঘাত হয়। এদের সবার কারণই জল ও খাদ্য।

রোগ হলে ডাক্তারবাবুদের কাছে যেতেই হবে, খরচ হবে। তাই খরচ বাঁচাতে গেলে রোগ নিরাময়ের থেকে রোগ প্রতিরোধ করা ভালো। উপরোক্ত রোগগুলি থেকে আমরা নিজেদের নিরাপদে রাখব কীভাবে? ব্যাপারটা মোটেই কঠিন কিছু নয়। আমাদের কেবল জানতে হবে যে জল বা খাদ্য আপনি মুখে নিচ্ছেন তা জীবাণুমুক্ত না সংক্রামিত। এই জীবাণু বলতে যা জানানো হচ্ছে তাকে প্রধানত চার ভাগে ভাগ করা যায় আকৃতি অনুসারে।

রোগ সৃষ্টিকারী ‘জীবাণু’

(ক) **ভাইরাস**—চারটি ভাগের মধ্যে ক্ষুদ্রতম, যাকে পুরোপুরি জীব বলা যায় না। RNA বা DNA কোনো একটি এদের ‘শরীরে’ থাকে। এরা জীবিত প্রাণী বা উদ্ভিদের কোষ আক্রমণ করে বংশবৃদ্ধি করতে পারে ও রোগ সৃষ্টি করে।

মানবদেহে রোগ সৃষ্টিকারী ভাইরাসগুলোর মধ্যে প্রধান কয়েকটি হল—

১. হেপাটাইটিস ‘এ’ ভাইরাস: যকৃৎপ্রদাহ সৃষ্টিকারী

২. রোটা ভাইরাস, নরওয়াক ভাইরাস: আন্ত্রিক সৃষ্টিকারী

৩. পোলিও ভাইরাস: পোলিও/শৈশবীয় পক্ষাঘাত সৃষ্টিকারী

(খ) **ব্যাকটিরিয়া:** এরা পুরো জীব, এদের কোষে আর.এন.এ. ও ডি.এন.এ. উভয়েই আছে।

১. স্ট্যাফাইলোকক্কাস, ই কোলি, সিগেলা ইত্যাদি আন্ত্রিক সৃষ্টিকারী।

২. সালমোনেলা টাইফি—সান্নিপাতিক জ্বর সৃষ্টিকারী

৩. ক্লসট্রিডিয়াম বটুলিনাম—কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে বাসা বেঁধে পক্ষাঘাত এমনকী মৃত্যু ঘটাতে পারে।

৪. ভিব্রিও কলেরি: কলেরা সৃষ্টিকারী

(গ) **এককোষী প্রোটোজোয়া:** এগুলো তুলনায় বড়ো, ‘ইউক্যারিয়োটিক’ কোষ।

১. এন্টামিবা হিস্টোলাইটিকা—আমাশয় রোগ সৃষ্টিকারী

২. জিয়ার্ডিয়া ইন্টেস্টাইনালস—জিয়ার্ডিয়া জাতীয় আমাশয় রোগ সৃষ্টিকারী যাতে পায়খানা হয় গাঁজা গাঁজা।

(ঘ) **বহুকোষী পরজীবী বা কৃমি দ্বারা সংক্রমণ:**

১. পিন ওয়ার্ম

২. থ্রেড ওয়ার্ম

৩. গোল কৃমি

৪. ফিতা কৃমি ইত্যাদি।

রোগ সৃষ্টিকারী এইসব শত্রুদের নাম মনে রাখতে পাঠকদের বোধহয় খুব হিমশিম খেতে হচ্ছে, মনে মনে লেখককে গালিও দিচ্ছেন বোধহয়, এদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য কত জ্ঞানই না অর্জন করতে হবে। সাধারণ মানুষের পক্ষে এ কি সম্ভব? দূর, ডাক্তাররাই যা পারেন করুন। কিন্তু আদৌ তা নয়। শত্রু অনেক হলেও এদের মেরে ফেলার প্রক্রিয়া খুবই সহজ। খাদ্য তৈরির সময় সঠিক তাপ প্রয়োগ করা যা প্রাগৈতিহাসিককালে আগুন আবিষ্কারের পরে শুরু হয়েছে, এ ছাড়া জল ও খাবার গ্রহণের পূর্বে কিছু সাধারণ নিয়ম মেনে চলা এবং সব ক্ষেত্রেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা। ‘হু’ (WHO) বা বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কিত ৫ চাবি বা ৫ সূত্রই উপরোক্ত রোগসমূহ প্রতিরোধের চাবিকাঠি।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ২০১৫ সালের নিরাপদ খাদ্য বছরে যে পাঁচ চাবির পরামর্শ দিয়েছেন ও তা সম্পর্কিত যে ৫ তালার কথা এর পরের নিবন্ধে বলা হয়েছে, তার বিষয় আলোচনা এই প্রসঙ্গে দরকার, কারণ উপরোক্ত রোগসমূহ ৫ তালা বা ৫ সমস্যা বা ৫ পর্যায়ের কোনো-না-কোনো ত্রুটির ফলেই ঘটে থাকে। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. নীহাররঞ্জন মণ্ডল, এমবিবিএস, বর্তমানে সরকারি গ্রামীণ হাসপাতালের চিকিৎসক।

২০১৫ বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ঘোষিত নিরাপদ খাদ্য বছর

নিরাপদ খাদ্য বছর (২০১৫) পেরিয়ে এলাম। 'খামার থেকে থালা' পর্যন্ত খাদ্য নিরাপদ রাখার মূল সূত্রগুলো শক্ত নয়। কিন্তু সেগুলো আমরা জানি না, আর জানলেও মানি কি? লিখেছেন **ডা. নীহাররঞ্জন মণ্ডল ও শ্রী শুভদীপ মল্লিক**।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ২০১৫ বছরটিকে নিরাপদ খাদ্য বছর হিসাবে পালন করছে। সেইজন্য এই বছরের প্রথমে তারা ক্যালেন্ডার (Calender) ও ডায়রি (Diary) প্রকাশ করেছে। সারাবছর জুড়ে বিভিন্ন শিক্ষামূলক কর্মসূচি চালাচ্ছে। স্লোগান প্রকাশ করেছে Safe Food Healthy Lives (নিরাপদ খাদ্য ও স্বাস্থ্যকর জীবন) ইন্টারনেটে অনেক তথ্য ও ছবি দেওয়া আছে। বাঁশবনে ডোমকানা না হয়ে প্রধান বিষয়গুলিই আলোচ্য। এ ব্যাপারে সংস্থার মুখ্য প্রশ্ন— How safe is your food? From farm to plate, keep it safe (কত নিরাপদ আপনার খাবার? খামার থেকে খাবার পাত্র পর্যন্ত খাদ্যকে নিরাপদ রাখুন) ক্যালেন্ডার ও ডায়রিতে ১২টি পরামর্শ রাখা হয়েছে। যথা—

জানুয়ারি—কাঁচা খাদ্যদ্রব্য, শাক-সবজি, ইত্যাদি ব্যবহার করার আগে ও পরে হাত ধোওয়া (হাত ধোওয়া সম্পর্কে বিষদ আলোচনা করা আছে *স্বাস্থ্যের বৃত্তে*-র প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যার ২৬ ও ২৭ নং পৃষ্ঠায়, লেখক মানসরঞ্জন মাইতি)।

ফেব্রুয়ারি—রান্নায় ব্যবহৃত সবরকমের বাসনপত্র, কাটার জিনিস এবং সমতলসমূহ পরিষ্কার রাখা।

মার্চ—রান্নাঘরে কোনো রূপ পোকামাকড় বা ইঁদুর বেড়ালের মতো জন্তু না ঢোকে।

এপ্রিল—রান্না না হওয়া খাদ্যসামগ্রী এবং রান্না করা খাবার একসঙ্গে না রাখা। এর ফলে রান্না হয়ে যাওয়া খাদ্যে সংক্রমণ স্থানান্তরিত হতে পারে।

মে—সর্বদা এবং সর্বথা নিরাপদ জল ও তাজা বা টাটকা খাদ্যদ্রব্য ও শাকসবজি রান্নার জন্য ব্যবহার করা উচিত।

জুন—খাদ্য বিষণকারী জীবাণুসমূহ যাতে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয় তার জন্য সম্পূর্ণভাবে রান্না করা উচিত।

জুলাই—তৈরি খাবার গরম গরম পরিবেশন করা উচিত।

আগস্ট—কাঁচা খাওয়া যায় এমন শাকসবজি ও ফলমূল ভালোভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে ধুয়ে খাওয়া উচিত।

সেপ্টেম্বর—তৈরি খাবার ঘরোয়া তাপমাত্রায় ২ ঘণ্টার বেশি রাখা ঠিক নয়।

অক্টোবর—ফ্রিজের মধ্যে ২°C থেকে ৫°C তাপমাত্রার মধ্যে রান্না করা ও পচনশীল খাদ্য সংরক্ষিত রাখা উচিত।

নভেম্বর—রান্নার জন্য কাঁচা বা প্রক্রিয়াজাত বাক্সবন্দি খাদ্য কেনার সময় ও ব্যবহারের আগে মেয়াদ শেষের তারিখ দেখে নেওয়া উচিত।

ডিসেম্বর—শরীরে বা চামড়ায় সংক্রমণজনিত কোনো রোগ থাকলে বা গুরুতর অসুস্থ হলে খাদ্য প্রস্তুত করা বা রান্না করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

এই সমস্ত পরামর্শ সংক্ষিপ্তাকারে **৫টি চাবির** সাহায্যে প্রথমেই ক্যালেন্ডারে বর্ণিত আছে।

চাবি ১: পরিচ্ছন্নতা (keep clean)

পরিবেশের মধ্যে অসংখ্য রোগজীবাণু আছে। বাগানে মাটি বা জল বা খাদ্য প্রস্তুতির সরঞ্জামের মাধ্যমে তা খাদ্য ও পানীয় দ্বারা আমাদের শরীরে প্রবেশ করতে পারে। আণুবীক্ষণিক সংক্রমণকারী এই শত্রুদের দেখা যায় না। গন্ধ শুঁকে বা স্বাদ নিয়েও বোঝা যায় না। খাদ্য নিরাপত্তার উপায়গুলি মেনে চলেই এদের থেকে আমরা বাঁচতে পারি। তাই খাদ্য প্রস্তুতির আগে, খাদ্য গ্রহণের আগে, শৌচালয় ব্যবহারের পর, কোনোকিছু নোংরা ঘাঁটার পর বা খেলাধুলোর পর হাত ধোওয়া উচিত। রান্না সরঞ্জাম, কাটার পাটাতন ইত্যাদি জল এবং সাবানজাতীয় পদার্থের সাহায্যে বা বিশেষ রাসায়নিকের সাহায্যে যতটা সম্ভব জীবাণুমুক্তভাবে পরিষ্কার করা ও রান্নাঘরের জিনিসগুলি কীটপতঙ্গ ও অন্যান্য প্রাণী থেকে নিরাপদে রাখা উচিত। রাঁধুনি এবং অন্যান্যরাও ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখবেন। (ক্যালেন্ডারে জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ এবং আগস্টে এ বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া আছে।)

চাবি ২: কাঁচা এবং রান্না হওয়া খাবার আলাদা রাখা (seperate raw and cooked)

মাছ, মাংস, ডিম, দুধ এবং সামুদ্রিক খাবারে রোগ জীবাণু সহজেই বংশবৃদ্ধি করে। তৈরি খাবারের কাছে পূর্বোক্ত খাবারগুলি রান্না না করা অবস্থায় থাকলে সহজেই জীবাণু স্থানান্তর হতে পারে। তার জন্য উপরোক্ত খাদ্যসমূহ এবং রান্না না করা অন্য খাবার, রান্না করা খাবার থেকে আলাদা রাখা উচিত। কাঁচা খাদ্য দ্রব্য কাটার এবং তৈরি করার সরঞ্জাম রান্না করা খাদ্যদ্রব্যের

সরঞ্জামের থেকে আলাদা রাখা উচিত। এই দু-রকমের খাবার সংরক্ষণ করতে হলেও আলাদাভাবেই তা করা উচিত। সামর্থ্য থাকলে ২ রকম খাবারের জন্য ২টি ফ্রিজ ব্যবহার করার কথা ভাবতে পারেন। (ক্যালেন্ডারে এপ্রিল মাসে এ বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া আছে।)

চাবি ৩: সম্পূর্ণভাবে রান্না করা (cook thoroughly)

যথাযথ রান্না প্রায় সবরকম জীবাণু ধ্বংস করে। বেশিরভাগ জীবাণু ৭০^{o}C তাপমাত্রার উপরে বাঁচে না। খাবার রান্না করার জন্য আদর্শ তাপমাত্রা হল ১০০^{o}C অর্থাৎ যে তাপমাত্রায় জল ফোটে। যে সব খাবারগুলির বিশেষ নজর রাখতে হবে তা হল রোস্ট করা খাবারের রোল, মাংসের কিমা, বড়ো অস্থি সন্ধি এবং মুর্গমুসল্লম ধরনের খাবার, কারণ এগুলিতে জীবাণু সংক্রমণের সম্ভাবনা বেশি। মাছ মাংস ডিম, সামুদ্রিক মাছ, স্যুপ জাতীয় খাবারকে ফোটা পর্যন্ত, স্টু-জাতীয় খাবারকে ৭০^{o}C তাপমাত্রার ওপরে রান্না করা উচিত। উপরোক্ত খাবারগুলির 'গ্রেভি' যেন পরিষ্কার থাকে এবং লালাভ না হয়। থার্মোমিটার ব্যবহার করতে পারলে ভালো। রান্না করা ফ্রিজে সংরক্ষিত খাবার খেতে হলে পুনরায় আগে যতটা তাপমাত্রা বলা হয়েছে ততটা তাপমাত্রায় গরম করা উচিত। (ক্যালেন্ডারে জুন মাসে এ বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া আছে)

চাবি ৪: নিরাপদ তাপমাত্রায় খাবার রাখা (keep food at safe temperature)

ঘরোয়া তাপমাত্রায় (২৫^{o}C - ৪০^{o}C) জীবাণু খুব তাড়াতাড়ি বংশবৃদ্ধি করে। তবে যেহেতু ক্ষতিকর জীবাণুরা ৫^{o}C থেকে ৬০^{o}C পর্যন্ত কমবেশি বাড়তে পারে, তাই ৫^{o}C- ৬০^{o}C পর্যন্ত তাপমাত্রা অঞ্চলকে বলা হয় বিপজ্জনক তাপীয় অঞ্চল (temperature danger zone-TDZ)। ৫^{o}C-এর নীচে এবং ৬০^{o}C তাপমাত্রার উপরে অধিকাংশ ক্ষতিকর জীবাণুর বংশবৃদ্ধি খুব কমে যায়। তাই খাবারকে ৫^{o}C-এর নীচে অথবা ৬০^{o}C-এর উপরে রাখা উচিত। ঘরোয়া তাপমাত্রায় খাবার ২-৪ ঘণ্টা রাখা যেতে পারে। ফ্রিজের মধ্যেও রান্না করা খাবার এক দু-দিনের বেশি সংরক্ষণ করে রাখা উচিত নয়। ঠান্ডায় জমাট-বাঁধা খাদ্য ঘরোয়া তাপমাত্রায় অনেকক্ষণ (২ ঘণ্টা) ধরে গলতে দেওয়া উচিত নয়। ঠান্ডা খাবার ঠান্ডা খান, গরম খাবার গরম খান। (ক্যালেন্ডারে জুলাই, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাস এবিষয়ে পরামর্শ দেওয়া আছে)।

চাবি ৫: নিরাপদ জল ও নিরাপদ কাঁচা খাদ্যদ্রব্য ব্যবহার করা (use safe water and raw materials)

জল, বরফ এবং কাঁচা খাদ্যদ্রব্য বিপ্‌জনক জীবাণু দ্বারা সংক্রামিত এবং বিষাক্ত রাসায়নিক মিশ্রিত হতে পারে। এর ফলে খাদ্যবিষণ এবং খাদ্যজাত সংক্রমণ হয়। তাই কাঁচা খাদ্যদ্রব্য ভালোভাবে ধোওয়া এবং খোসা ছাড়িয়ে নিরাপদ অবস্থায় খাওয়া উচিত। নিরাপদ জল ব্যবহার করা এবং জলকে নিরাপদ রাখা বাঞ্ছনীয়। টাটকা এবং স্বাস্থ্যকর খাবার নির্বাচন করা, পাস্তুরাইজড করা জীবাণুমুক্ত দুধ ও প্রক্রিয়াজাত নিরাপদ খাদ্যই খাওয়া উচিত। (ক্যালেন্ডারে মে, আগস্ট, নভেম্বর, ডিসেম্বর মাসে এবিষয়ে পরামর্শ দেওয়া আছে)।

চাবি তো জানা হল কিন্তু এদের তালা কী?

তালা আছে ৫টি। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা আওয়াজ তুলেছে, ''খামার থেকে খাবার পাত্র পর্যন্ত খাদ্যকে নিরাপদ রাখুন''। তবে আমরা যারা বাজার থেকে খাদ্য কিনি, তাদের জন্য ''খামার থেকে থালা'' না বলে ''বাজার থেকে থালা'' বলাই ভালো। এই রাস্তাটিকে ৫টি ভাগে ভাগ করা যায় যা ৫টি তালার সমতুল্য। এগুলি যথাক্রমে—

১. বাজার করা ২. রান্নার প্রস্তুতি ৩. রান্না ৪. রান্না করা খাবার রাখা এবং সংরক্ষণ ৫. খাদ্যগ্রহণ (বা 'থালা')।

পাঁচটি চাবিকে আমরা যদি ৫টি সূত্র হিসাবে বিবেচনা করি, তাহলে উপরোক্ত পাঁচটি সমস্যার সমাধান এই সূত্রগুলি দ্বারা সম্ভব। এই ৫টি পর্যায়ের জন্য কোন কোন চাবি কার্যকর তা নিম্নে দেখানো হল।

খামার/বাজার
চাবি ৫
টাটকা ও নিরাপদ খাদ্য কেনা

রান্নার প্রস্তুতি
চাবি ৫ + চাবি ১
নিরাপদ জল ও কাঁচা খাদ্যদ্রব্য ব্যবহার এবং পরিচ্ছন্নতা

রান্না
চাবি ১ + চাবি ৩
পরিচ্ছন্নতা ও সম্পূর্ণভাবে রান্না করা

খাদ্য গ্রহণ বা 'থালা'
চাবি ১ + চাবি ৩
পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ উষ্ণতার খাবার গ্রহণ করা

রান্না করা খাবার রাখা ও সংরক্ষণ
চাবি ৪ + চাবি ২
নিরাপদ তাপমাত্রায় খাদ্য রাখা ও রান্না করা ও রান্না না করা খাবার পৃথক রাখা।

১. বাজার (বা বাজার থেকে খাদ্য কীভাবে কেনা হবে যাতে আপনি টাটকা, তাজা, এবং ভালো খাবার পাবেন,
২. রান্নার প্রস্তুতি,
৩. রান্না করা,
৪. রান্না করা খাবার রাখা ও সংরক্ষণ এবং,
৫. খাদ্য গ্রহণ।

এই পাঁচটি তালা সম্পর্কে পরের সংখ্যায় আলোচনা করার ইচ্ছা থাকল।

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. নীহাররঞ্জন পাল, এমবিবিএস, বর্তমানে একটি সরকারি গ্রামীণ হাসপাতালে কর্মরত।
শ্রী শুভদীপ মল্লিক, হোটেল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ক্যাটারিং টেকনোলজি প্রশিক্ষিত, বর্তমানে একটি ইনস্টিটিউটে শিক্ষকতা করেন।

গল্প নয়

ডাক্তারবাবু

ডা. অনিরুদ্ধ দেব

''ডাক্তারবাবু, ভাবতে পারবেন না, কী খাটনি। সপ্তাহে ২টো নাইট, ২টো ডে, আর ২টো জেনারেল ডিউটি। রবিবারও ছুটি নেই।''

সামনে বসা ছেলেটার বয়স অল্প। কাগজে দেখলাম লেখা ২৭। বি-টেক, এম-টেক শেষ করে একটা মস্ত সরকারি কর্পোরেশন-এ ট্রেনি ম্যানেজমেন্ট পদে যোগ দিয়েছে। মাইনে-কড়ি ভালো, কিন্তু কাজের চাপ! বাপরে!

বললাম, ''তাহলে সপ্তাহে কোনো ছুটিই নেই? রবিবারেও না?''

''ডাক্তারবাবু, ভাবতে পারবেন না, কী খাটনি। রবিবারও ছুটি নেই।''

বলল, ''না, না। সব রবিবারে কাজ থাকে না। আপাতত আমরা ট্রেনিং-এ আছি বলে আমরা মাসে ১টা রবিবারে ডিউটি করি।''

কী মনে হল, জিজ্ঞেস করলাম, ''নাইট ডিউটির পরদিনও কাজ থাকে?''

ছেলেটা আমার দিকে তাকাল এমনভাবে, যেন আমারই সাইকিয়াট্রিক চিকিৎসা দরকার। বলল, ''তা কী করে সম্ভব? নাইট ডিউটি হলে পরদিন তো দিনে কাজে যাই না। দুটো নাইটের পরে একটা ডে অফ থাকে।''

তা হলে সপ্তাহের হিসেব গুলিয়ে যায় না? যায়, কিন্তু বোঝা গেল, ডিউটির সপ্তাহ আর ক্যালেন্ডারের সপ্তাহ এক না। ছুটির দিনগুলো ওরা গোনেই না। এত কাজের চাপ, ছুটির দিনগুলো দেখতে দেখতে চলে যায়। চোখের পলক ফেলার সময় পায় না মানুষ।

তাই বটে। শুনতে শুনতে আমাদের নিজেদের ছোটোবেলার কথা মনে পড়ছিল। ডাক্তারি পাশ করে হাউসস্টাফশিপের কথা। ছুটি বলে কিছু ছিল না কোনোদিনই। হাসপাতালে ছুটি হত বছরে দশ দিন, সে দিনগুলো কেবল আউটডোর বন্ধ। ভর্তি রোগীর জন্য হাসপাতাল বন্ধ থাকতে পারে না—সে দিন বড়ো ডাক্তারদের ছুটি। ছোটোদের নয়।

''নাইট ডিউটির পরদিনও কাজ থাকে?'' ছেলেটা আমার দিকে তাকাল এমনভাবে, যেন আমারই সাইকিয়াট্রিক চিকিৎসা দরকার।

নাইট ডিউটির কাহিনি অন্যরকম। ডিপার্টমেন্ট ছ-ভাগে বিভক্ত, এই ভাগগুলোর নাম ইউনিট। প্রত্যেকের সপ্তাহে একদিন আউটডোর আর অ্যাডমিশন ডে। অর্থাৎ সোমবার ইউনিট-১, মঙ্গলবার ইউনিট-২, এইরকম করে শনিবার ইউনিট-৬। যে দিনের অ্যাডমিশন, সে দিনের সকাল ৮টা থেকে পরদিন সকাল ৮টা অবধি যত রোগী ভর্তি হবে, সবই সেই ইউনিটের দায়িত্বে।

ব্যাপারটা কী দাঁড়াত? অ্যাডমিশন ডে-র সকালে ৮টায় এক ছুটে এমার্জেন্সিতে গিয়ে পৌঁছে সেখানে ভর্তিযোগ্য রোগী থাকলে তাদের ভর্তি করে, চিকিৎসা শুরু করে আউটডোর যেতে হত। তখনকার দিনে আউটডোর চলত সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা বা ২টো অবধি। আউটডোর শেষ হলে আবার এমার্জেন্সি। এখন আউটডোর বন্ধ, রোগী আসবে কেবল এমার্জেন্সিতে। এইবার এমার্জেন্সিতে থাকতে হত পরদিন সকাল ৮টা অবধি। এই সময়ের মধ্যে ক্ষুধা-তৃষ্ণা-বিশ্রাম বা নিদ্রা জাতীয় অন্য প্রয়োজনাদির দায়িত্ব কর্তৃপক্ষের নয়। তারা ক-টা থেকে ক-টা এবং কে কে ডিউটিতে, বলে খালাস। আমরা নিজেরাই হিসেব করে নিতাম কে কোথায়, এবং কখন কতটুকু বিশ্রাম নেবে। ''চট করে চান করে খেয়ে আয়'' বলে কাউকে পাঠিয়ে অনেককেই অনেকবার গজগজ করতে হয়েছে। ''আধ ঘণ্টা হয়ে গেলে বাবুর ফেরার নাম নেই।'' তখন মনে থাকত না, হস্টেল যেতে আসতেই মিনিট কুড়ি লেগে যায়।

আউটডোর থেকে রোগী ভর্তি হয়, হয় এমার্জেন্সি থেকেও। পরদিন সকালে ৮টা বাজলে এমার্জেন্সি ডিউটি শেষ। পরের দল এসে পড়ল। তখন যাদের এমার্জেন্সি শেষ হল, তাদের সাধারণ দৈনিক কাজ করতে যেতে হবে। আমরা শেষ রাতে দলের কয়েকজনকে পাঠিয়ে দিতাম, ''ফিরে যা হস্টেল।'' তারা গিয়ে ঘণ্টা দুয়েক ঘুমিয়ে সকালের খাওয়া সেরে ফিরে আসত। ততক্ষণে আমরা যারা রয়ে গেছি, তারা ভর্তি রোগীদের দেখাশোনা শেষ করে আটটায় ওরা আসার পরে, বড়ো ডাক্তাররা আসার আগে হস্টেল গেছি। আমাদের দাঁত মাজা, চান করা সারতে।

আসতেন তাঁরা সকাল ন-টা নাগাদ। তাঁরা, মানে বড়ো ডাক্তাররা। বেশি বড়ো ডাক্তার হলে সাড়ে ন-টা। এসেই প্রশ্ন, ''অনিরুদ্ধ (বা ত্রিদিব, বা অপালা) কোথায়?''

''ইয়ে, নাইট ডিউটি ছিল স্যার, হস্টেল গেছে। এল বলে।''

ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চন, হাতঘড়ি অবলোকন। ''ডিউটি আটটায় শেষ না?''

বলা বাহুল্য।

''এখন তো ন-টা কুড়ি বাজে।'' সেটাও বাহুল্য। বাহু উলটে ঘড়ি দেখতে সকলেই পারে।

যারা সামনে আছে, তাদের গল্প শুনতে হত, কেমন ডা. শ্যামল সেন যখন ওই আর.এম.ও. কোয়ার্টারের পেছনের ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে নামতেন, সেই সিঁড়ির মাথায় ওনার ধবধবে সাদা প্যান্টের নীচে চকচকে কালো জুতো দেখা গেলে কোনো হাউসস্টাফের ক্ষমতা ছিল না, মেডিক্যাল কলেজের মেন বিল্ডিং ছাড়া কোথাও থাকে। গল্পগুলো তাঁরাই বেশি বলতেন, যাঁরা ডা. শ্যামল সেনের ভয় আর পান না, আটটার ডিউটিকে ন-টায় ডিক্লেয়ার করে শেষে সাড়ে ন-টার কাছাকাছি আসেন। অনিরুদ্ধ, বা যাদের অপেক্ষায় অধীর হয়ে অপেক্ষমাণ ছিলেন, তারা এলে শুরু হত গত কাল সারা দিনে রাতে যে যে রোগী ভর্তি হয়েছে তাঁদের দেখাশোনা—বড়ো ডাক্তারবাবুদের সঙ্গে যাওয়া, রোগী দেখা, তাঁদের চিকিৎসাদির ব্যবস্থা সেরে ফুরসত হতে হতে প্রায় বিকেল। ততক্ষণ, বলা বাহুল্য, কারোরই খাওয়া নেই।

এরমধ্যে রোগীদের মধ্যে কারোর কোনো বিপদ হলে সমস্যা আরও বেড়ে যেত। এবং আগের দিন-রাতে এমার্জেন্সিতে যাঁরা ভর্তি হয়েছেন, কোনো ভয়ানক রোগ নিয়ে, তাঁদের মধ্যে অনেকেরই যে বিপদ হত, তাও কি বলে দিতে হয়!

অজস্র রোগীর ভিড়, কাজ বেশি, থামা কম, বিশ্রাম মানে ফাঁকি—এই পরিস্থিতিতে কাজ করতে গেলে ভুল হত না? বিশেষত যেখানে কাজের পরিবেশও অমানুষিক—এমার্জেন্সির ওয়ার্ডটাকে শুয়োরের খোঁয়াড় বললে আমার বন্ধুরা অনেকেই তেড়ে আসবেন, কিন্তু তার থেকে কতটা উন্নত ছিল? একদিন দিল্লির এক সর্বভারতীয় পত্রিকার সংবাদদাতা আমাকে ধরেছিলেন পূর্ব পরিচয়ের সূত্রে। কাগজ ওঁকে পাঠিয়েছিল কলকাতার সরকারি হাসপাতালের জুনিয়র ডাক্তাররা কেমন কাজ না করে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়ায় সেটা সরেজমিনে দেখে এসে প্রতিবেদন লিখতে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ চিরকালের অদূরদর্শী। সুপার তাঁকে দূর দূর করে ভাগিয়েছেন। আমি বলেছিলাম, ‘‘চলো, তোমাকে দেখিয়ে আনি।’’ আমার সঙ্গে এমার্জেন্সিতে ঢুকে ভদ্রলোক এক মিনিটও থাকতে পারেননি। সেখানকার বর্ণে, বিশেষ করে গন্ধে ওনার শরীর গুলিয়ে গিয়েছিল। বাইরে ছুটে এসে বমি করেছিলেন। পরে বলেছিলেন, ‘‘এই অমানুষিক অবস্থায় তোমাদের কাজ করতে হয়? আমি হলে পারতামই না।’’ তাতে সন্দেহ ছিল না। অন্য এমার্জেন্সি-নয়-এমন ওয়ার্ড এত নোংরা নয়—এই আশ্বাসেও তিনি আর কোনো ওয়ার্ড দেখতে রাজি হননি। ক্যান্টিনে বসে চা খেয়ে চলে গিয়েছিলেন। পরে জেনেছিলাম উনি নাকি সম্পাদকের নির্দেশে লিখতে চাননি, বলেছিলেন, উলটো লেখা লিখব, ডাক্তাররা কাজ করে, হাসপাতাল নিয়ে বরং সরকারের মাথাব্যথা নেই। এখানেও আর এক ‘অনর্থক’ কথা বলে ফেলি। ডাক্তারদের সম্বন্ধে ভালো লেখা কাগজে ছাপবে কেন? তার তো ‘সেনসেশন অ্যাপিল’’ নেই।

আমার সঙ্গে এমার্জেন্সিতে ঢুকে ভদ্রলোক এক মিনিটও থাকতে পারেননি। সেখানকার বর্ণে, বিশেষ করে গন্ধে ওনার শরীর গুলিয়ে গিয়েছিল। বাইরে ছুটে এসে বমি করেছিলেন।

তিরিশ তিরিশ ষাটটা বেড-এর জন্য তৈরি ছিল এমার্জেন্সি। ক্রমে ক্রমে সেখানে বেড-এর সংখ্যা বাড়তে থাকল। আইনি নির্দেশকে কলা দেখিয়ে কোনো হাসপাতালে দুটো বিছানার ফাঁকে যতটা জায়গা থাকা উচিত তা কমতে কমতে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে সোজা হেঁটে ঢোকা দায়, পাশ ফিরে কাঁকড়ার মতো হেঁটে ঢুকতে হত। তারপরে সে বিছানাগুলোও যখন ভরে গেল, তখন যদি আরও রোগীর ভর্তি দরকার হত? তখন মাটিতে ম্যাট্রেস পেতে সেখানেই উবু হয়ে বসে চিকিৎসা করেছি। কোনো কারণে দুই বেডের মাঝে মাটিতে একটু বেশি জায়গা থাকলে সেখানেও ম্যাট্রেস পেতে দিয়েছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। করিডোরে, এক দিক দিয়ে মাটিতে এক সারি বিছানা, অন্য দিক দিয়ে হাঁটা-চলা-ফেরা। এক দিন, মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী আসবেন পরিদর্শনে। শাসকদলের স্টুডেন্টস উইং আমাদের আহ্লাদের সঙ্গে জানিয়েছে, উনি এসে যদি দেখেন, মাটিতে বিছানা করে রোগী! উনি এ সব অরাজকতা সহ্য করবেন না। আফটার অল উনি ডাক্তারি পাশ করেছিলেন কোনোদিন, তাই না!

পরে শুনলাম, ঠিক যেমন মনে করা হয়েছিল—তাই হয়েছিল। মাননীয় মন্ত্রী এসে ওয়ার্ডে ঢোকেননি। করিডোরের কোল্যাপসিবল গেটের বাইরে থেকেই বলেছিলেন, ‘‘এ কী! মাটিতে পেশেন্ট কেন? এমনটা হওয়া উচিত না।’’ বলে সুপার আর ওয়ার্ড মাস্টারের দিকে তাকিয়েছিলেন, তাঁরা ঘাড় কাত করে বলেছিলেন, ‘‘না, স্যার, মোটেই না।’’

পরদিন সকাল আটটার মধ্যে করিডোরে মাটিতে যাঁরা চিকিৎসা পাচ্ছিলেন, তাঁদের ওখানেই নতুন খাট দেওয়া হয়েছিল। এবং যতটা জায়গা বাকি ছিল, ভরে দেওয়া হয়েছিল মাটিতে নতুন রোগী দিয়ে। কাজের জায়গা কমেছিল আরও।

এই অদ্ভুত অবস্থায় কাজ করতে ভুল হত না?

বলতে ভালো লাগে, যতটা ভুল হতে পারত ততটা হত না। অবশ্য হলেও কত ধরতে পারতাম, কে জানে। অত রোগী ভর্তি না হলে অনেক বেশি রোগী বাঁচাতে পারতাম? হয়তো। কিন্তু যারা ভর্তি হতেন না, তাঁদের মধ্যে অনেকেই বেঘোরে মারা যেতেন, সন্দেহ নেই।

• •

এটা একটা ভুলের গল্প। কিন্তু ভুলের আগে একটা মজার গল্প মনে পড়ছে। সেটা বলে নিই।

রোগী ভর্তি হলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা বাড়ির লোককে বলতাম পাশে থাকতে। বিপদে-আপদে, কোনো দরকারে, যেখানে মাত্র-দু-জন নার্স আর চারজন স্টুডেন্ট নার্স এবং বেশি হলে ছ-জন ডাক্তার মিলে সবশুদ্ধ এক-শো কুড়ি বা তারও বেশি রোগীর দেখাশোনা করছে, সেখানে বাড়ির লোকের একজোড়া চোখ থাকলে ভালো হয়। ‘‘ডাক্তারবাবু, মাথা ব্যথা বলছে, ‘‘ডাক্তারবাবু, হিক্কা উঠছে,’’ ‘‘খাট থেকে পড়ে গেছে,’’ ‘‘আর বোধহয় নেই . . .’’ এমন অনেক খবর নিয়ে এসেছে বাড়ির লোকে, নার্সিং স্টেশনে। সবচেয়ে বেশি যেটা শুনেছি তা হয়তো, ‘‘ডাক্তারবাবু, ড্রিপ বোতল খালি হয়ে গেছে।’’

সে দিনের সেই রোগীর বাড়ির লোক হয়তো ক্লান্ত ছিল, কিংবা অন্য কিছু—যতবার কেউ আমাদের কেউ তার খাটের পাশ দিয়ে যাচ্ছে, দেখে হয় সে ঢুলছে, নয়তো টেনে ঘুমোচ্ছে। অনেকবার ধাক্কা দিয়ে তোলা হয়েছে। বলা হয়েছে, ‘‘আপনি রোগীর পাশে ঘুমোনোর জন্য নেই। আপনি ঘুমিয়ে পড়লে রোগীর ভালোমন্দ কিছু হলে কে দেখবে . . .’’ ইত্যাদি। লোকটা জেগে উঠে খানিকক্ষণ ঢুলেছে, তার পরে আবার ঘুমিয়ে পড়েছে।

আমরা কাজ করছি, মেজাজ খারাপ। লোকটাকে ঘুমোতে দেখে আরও তিরিক্কি হয়ে উঠছে মেজাজ। একবার আমরাই কেউ ‘‘দেখছ, ড্রিপ শেষ হয়ে গেছে, হুঁশও নেই,’’ বলে ড্রিপ বোতল বদলে দিয়েছি (তখনকার দিনে কাচের বোতলে ড্রিপ আসত)। শেষে, তখন রাত্তির প্রায় আড়াইটে, একজন স্টুডেন্ট নার্স হাসতে হাসতে এসে বলল, ‘‘দেখুনগে কী অবস্থা।’’

অবস্থা দেখে আমাদের চক্ষু চড়কগাছ, মেজাজ সপ্তমে। বেহুঁশ রোগীকে ঠেলেঠুলে সরিয়ে রোগীর বাড়ির পাহারাদার লোকটি তার পাশে শুয়ে টেনে ঘুমোচ্ছে। সিনিয়র নার্স আমাকে বললেন, ‘‘ডি ডাব্লু দিন!’’ ব্যস! আমাকে আর পায় কে।

ডি ডাব্লু মানে ডিস্টিল্ড ওয়াটার, বা ওয়াটার ফর ইঞ্জেকশন। এতে অ্যান্টিবায়োটিক পাউডার গুঁড়ো গুলে নিয়ে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। শুধু ডিস্টিল্ড ওয়াটার ইঞ্জেকশন দিলে সমস্যা কিছু নেই, কিন্তু ব্যথা হয় ভারী। সিরিঞ্জে দুই মিলিলিটার ডি ডাব্লু নিয়ে চুপি চুপি গিয়ে ঘুমন্ত বাড়ির লোকের পশ্চাৎদেশে প্যাঁট করে দিয়েছি ইঞ্জেকশন।

হাউমাউ করে উঠে বসে সে দেখে আমি সিরিঞ্জ হাতে দাঁড়িয়ে। বলেছি, ‘‘চুপ করে শুয়ে থাকুন, এই তো জ্ঞান ফিরে এসেছে।’’ লোকটা আরও হাউ হাউ করে, আমি বলেছি, ‘‘আরে, কী হল . . .’’ বলে যেন এই প্রথম খেয়াল হল, এমন মুখ করে বলেছি, ‘‘এ কী! আপনি এখানে কী করছেন? সব্বনাশ করেছে! এখন কী হবে?’’

লোকটার মুখের ভাব দেখার মতো! বলছে, ‘‘কী হল? আমাকে কী ইঞ্জেকশান দিলেন?’’ আমি ততোধিক ভালোমানুষ সেজে বলেছি, ‘‘সব্বনাশ! এখন কী হবে?’’ আশেপাশের সব জেগে থাকা রোগী আর তাঁদের বাড়ির লোকের মুখে হাসি আর ধরে না।

‘‘জেগে থাকুন এখন, কী আর করা। ঘুমিয়ে পড়লে কী হবে কেউ বলতে পারবে না,’’ বলে আমি ওখান থেকে হাওয়া।

এরপর আর সে ঘুমোয়নি।

. . . .

তখন আমি আর সে ‘‘ইউনিট’’-এ নেই, কিন্তু সিনিয়র হবার সুবাদে আমার উত্তরসূরি, জবা আর সুনীপা—প্রায়ই, ‘‘দাড়িদা, এটা . . . দাড়িদা, ওটা . . .’’ বলে পরামর্শ চায় (ইয়ে, আমার দাড়ি যারা দেখেননি, তাঁরা পরামর্শের স্যাম্পেল চাইবেন না যেন)। আমিও আমার সীমিত জ্ঞান নিয়েই দাদা হিসেবে নির্দেশ দিই। একদিন বিকেলে সুনীপা ক্যান্টিনে এসে আমাকে বলল, ‘‘দাড়িদা, একটু আসবে? একটা লোক ভর্তি হয়েছে, অবস্থা সঙ্গিন। তার ছেলে খুব অসভ্যতা করছে, আমরা সামলাতে পারছি না। জবা আছে, বলেছে তোমাকে ডেকে নিয়ে যেতে।

গেলাম। গিয়ে দেখি জবা মাটিতে শোয়া একজন অতিবৃদ্ধ অজ্ঞান ব্যক্তির সামনে উঁবু হয়ে বসে পরীক্ষা করছে, আর সামনে একটি বছর চল্লিশের লোক খুবই অভদ্র ভাষায় জবার নারীত্ব, সেইজন্য ডাক্তারির জ্ঞানের অভাব, মাটিতে শুইয়ে রোগীর চিকিৎসা করার মতো অমানবিকতার নিন্দায় পঞ্চমুখ।

সোমত্থ পুরুষ দেখে তার গলার জোর কমলেও বক্তব্যের ধার কমল না। আমি পৌঁছোনো-মাত্র জবা আমাদের রোগীর রোগবিবরণ ছিল, যেন আমি খুব সিনিয়র ডাক্তার। আমিও দাড়িতে হাত বুলিয়ে যথাসম্ভব গম্ভীর মুখে শুনলাম।

শোনার বিশেষ কিছু ছিল না। অবস্থা খুবই খারাপ। রাত কাটে কি না সন্দেহ। চল্লিশবর্ষীয়কে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘‘কে হয়?’

সে বলল, ‘‘আমার বাবা।’’

আমি বললাম, ‘‘এ রকম অবস্থা হল কী করে? ক-দিন কেউ দেখাশোনা করেনি? এ তো আজকের ঘটনা নয়?’’

লোকটার গলায় তাচ্ছিল্য ঝরে পড়ল। বলল, ‘‘আমি কে জানেন?’’

‘‘কেন? আপনি জানেন না?’’ এই লাইনটা তখনও শিখিনি, তাই বলতে পারলাম না, কিন্তু জানতাম উত্তর তিনিই দেবেন, তাই চুপ করে রইলাম। লোকটা তখনকার দিনের উত্তর কলকাতার এক বিশিষ্ট গুণ্ডা-প্রকৃতির রাজনৈতিক নেতার নাম করে বলল, ‘‘আমি ওনার ডান হাত।’’

আমি জবার দিকে তাকিয়ে ওই রাজনৈতিক দলের ছাত্রদলের আমাদের কলেজের এক বড়ো মাপের নেতার নাম করে বললাম, ‘‘সৌরিশকে খবর দে, বলিস, অমুকদার ডান হাতের বাবা আমাদের আন্ডারে ভর্তি। অবস্থা খুব খারাপ, আজ রাতেই কিছু একটা হয়ে যেতে পারে—ও যদি এর মধ্যে একটা বেডের ব্যবস্থা করতে পারে ভালো, নইলে এইভাবে মাটিতেই থাকতে হবে . . .’’

আমার চালাকিটা কাজে লাগল। লোকটা বলল, ‘‘না না, সৌরিশদাকে খবর দিতে হবে না। আমিই জানিয়ে দেব-খন।’’ বললাম, ‘‘আপনি কী করেন?’’

লোকটা আমতা আমতা করে বলল, সে রাজনৈতিক নেতার বাড়িতে হয় ঝাঁট দেয়, নয়তো মাকড়সার ঝুল ঝাড়ে, বা অমন একটা কিছু। আমি আবার বললাম, ‘‘এঁরা যতদূর সম্ভব করবেন। কিন্তু অবস্থা খুবই খারাপ। আপনাদের কাউকে থাকতে হবে।’’

আবার লোকটা দেখলাম থতমত খেল। বলল, ‘‘স্যারের বাড়িতে আমার অনেক কাজ। থাকতেই হবে?’’

আমি বললাম, ‘‘না থাকলে খারাপ কিছু ঘটলে তো খবর দেবার কোনো উপায় নেই . . .’’

আমি (বড়ো ডাক্তারের মতো) চলে গেলাম, পরে জবা আর সুনীপা এসে বলল, ‘‘তুমি চলে যাবার পরেই আবার স্বমূর্তি ধরেছে, বলেছে বাবার কিছু হলে দেখে নেবে।’’

বললাম, ‘‘সৌরিশকে খবর দিয়ে রাখিস।’’

জবা তেড়ে বলল, ‘‘ও, হ্যাঁ, তুমি কী গো? কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই? তুমি জানো না, সৌরিশদা অন্য ক্যাম্পের? ভাগ্যিস এই লোকটা ঘর ঝাঁট দেয়—পলিটিক্যাল ওয়ার্কার হলে তোমাকে দিত ওখানেই!’’

ওরে বাবা!

যাই হোক, দিন কাটে, যে যার কাজে ব্যস্ত। আমার নিজের কাজের জন্য ক-দিন ওদের ইউনিটের খবর নিতে পারিনি, শনিবার অ্যাডমিশন ডে গিয়েছে, সোম বা মঙ্গলবার বিকেলে ক্যান্টিনে ওরা আমাকে ধরল, রোগীদের খবর দিতে। এর কথা, তার কথা হতে হতে, হঠাৎ আমার মনে পড়ল, বললাম, ‘‘আর ওই বুড়োর কী খবর? মারা গিয়েছে?’’

‘‘কে বুড়ো?’’

‘‘আরে ওই যে রাজনৈতিক নেতার বাড়ির কাজের লোকের বাবা . . .’’ বলতে বলতে জবা আর সুনীপা দেখি এর ওর দিকে তাকায়। আর তার পরেই, চা, চপ, সব ফেলে দু-জনে প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

আমি মনে মনে, ‘‘কেলো করেছে,’’ বলে, যেহেতু আমার তাড়া নেই, তাই ধীরে সুস্থে নিজের চা শেষ করে ওদের পেছনে গেলাম।

গিয়ে দেখি যেখানে পেশেন্ট ছিল, সেখানে মাটিতে অন্য রোগী, জবা আর সুনীপা সেখানে দাঁড়িয়ে কী শলা পরামর্শ করছে। আমাকে দেখে বলল, ‘‘দাড়িদা, এইখানে পেশেন্টটা ছিল না?’’

ছিল। এইখানে পেশেন্ট ছিল, এইখানে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম, আর ওইখানে দাঁড়িয়ে ছেলে আমাদের গালাগালি করছিল।

‘‘কোথায় গেল?’’ জবার প্রশ্নের উত্তরে বললাম, ‘‘তিন দিন ধরে মাটিতে পড়ে নেই। দেখ নিশ্চয়ই কোনো বেডে দিয়েছে।’’

তিনজনে খুঁজতে শুরু করলাম। লোকটার মুখ কারোরই মনে নেই। কষ্ট করে নাম মনে করে বেডে বেডে গিয়ে বেড-হেড টিকিট দেখে দেখছি আর সেই সঙ্গে জবা আর সুনীপাকে বকুনি দিচ্ছি, ‘‘বার বার বলেছি, একটা ডায়েরি রাখ। আমি রাখি বলে হাসাহাসি করিস, তাতে আজেবাজে গালাগালি লিখে দিস (গালাগালি কই লিখেছি? ওই হল, আজেবাজে কথা লিখিস তো), দেখ এখন কী কাণ্ড।’’

কোথাও নেই পেশেন্ট। মরে গিয়েছে? কিন্তু তাহলে তো নির্ঘাৎ জানা যেত। ডেথ সার্টিফিকেট না লিখলে তো মর্গে নিয়ে যাবে না . . . যদি অন্য কোনো ইউনিটের ডাক্তার লিখে দিয়ে থাকে? সেটা আরওই অসম্ভব . . . ইত্যাদি আলোচনা চলতে থাকল . . .

নার্সিং স্টেশনে গিয়ে নার্সকে জিজ্ঞেস করলাম, ওরাও কিছু বলতে পারল না। ওদেরও বকলাম, কিন্তু পেশেন্টের হদিশ নেই।

জবার কী খেয়াল হল, নার্সিং স্টেশন থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

এবার মেডিক্যাল কলেজের এমার্জেন্সি ওয়ার্ডের জিয়োগ্রাফিটা না বললে এগোনো যাবে না।

এমার্জেন্সিতে ঢুকে প্রথমে ডান দিকে এমার্জেন্সি ক্লিনিক, তার পরে আরও এগিয়ে একটা কোল্যাপসিবল গেট পেরিয়ে ডান দিকে বাঁ দিকে করিডোর চলে গিয়েছে, সেই করিডোর দিয়ে গিয়ে এমার্জেন্সি মেডিক্যাল ওয়ার্ড। যখনকার কথা বলছি তখন করিডোরও ওয়ার্ড। তারপরে আরও একটা কোল্যাপসিবল গেট, যেটা কোনোদিন বন্ধ হত না বলে মরচে পড়ে বেঁকে গিয়েছে, নানা প্লাস্টিক, লিউকোপ্ল্যাস্ট দিয়ে তাকে খোলা অবস্থায় ধরে রাখা থাকে। সেই গেট পেরোলে একটা চত্বর। তার শেষে একটা লিফট। আজকাল যেমন একটা দেওয়াল ঘেঁষে লিফট থাকে, এটা তেমন না। এটা চত্বরের পেছনের দেওয়াল থেকে খানিকটা এগিয়ে, কারণ লিফটের ডান দিক দিয়ে সিঁড়ি উঠেছে, সিঁড়ি ঘুরে লিফটের পেছন দিয়ে দো-তলায় উঠেছে। লিফটের বাঁ-দিক ফাঁকা। সে দিক দিয়ে লিফটের পেছনে যাওয়া যায়। সেখানে একটা দরজা আছে, যখন তৈরি হয়েছিল, তখন সেখান দিয়ে ময়লা নিয়ে যাওয়া হত। আজ সে দরজায় তালা বন্ধ, তার চাবি কোথায় কেউ নিশ্চয়ই জানে না, খুঁজে পেলেও তা দিয়ে সে মরচে পড়া তালা খুলবে কি না কে জানে, হয়তো তালা ভাঙতেই হবে (তালা আর দরজার যা চেহারা, তার চেয়ে দরজা ভাঙা সহজ হবে)। এই চত্বরের দু-দিকেও রোগীর বেড, এবং যেখানে বেড শেষ হয়েছে, সেখানে, সিঁড়ি শুরু হবার আগে, বা লিফটের দরজার বাঁ-দিকে, মাটিতে ম্যাট্রেস পেতে পেশেন্টের অবস্থান।

যেখানে মাটিতে পেশেন্টের শোয়া শেষ, বাঁ-দিকের সেই পেশেন্টদের সারি পেরিয়ে, লিফটের পেছনে, সেই প্রায় ভাঙা দরজার সামনে ম্যাট্রেসের ওপরে শোয়া অবস্থায় সেই পেশেন্টকে খুঁজে পেল জবা। তিনদিনে তার ড্রিপের বোতল খালি, তার চাদর মলমূত্রে মাখামাখি, চারিদিকে নোংরা, তার মধ্যে রোগী দিব্যি বেঁচে আছে। কোনো ডাক্তারি ছাড়া, কোনো খাদ্য-পানীয় ছাড়া!

যতক্ষণে ওয়ার্ড বয় ম্যাট্রেস শুদ্ধু রোগীকে টেনে আবার দৃশ্যমান অবস্থায় এনে বিছানার চাদর বদলেছে, জবা নতুন ড্রিপ বোতল লাগিয়েছে, সুনীপা নাকের ‘‘রাইল’স টিউব’’ দিয়ে তাকে কিছু তরল পুষ্টি দিচ্ছে, আর নার্সকে বলছে, এই অন্যায়ের শাস্তি হিসেবে নার্সের উচিত এখুনি এই রোগীকে মাটি থেকে বেড-এ তোলা . . . ততক্ষণে এদিক-ওদিক জিজ্ঞেস করে আমি রহস্যের সমাধান করেছি। শনিবারের ডিউটি শেষে জবা আর সুনীপা রবিবার সকালে চলে যাবার পরে রবিবার সারা দিন অনেক রোগী ভর্তি হয়েছে। সেই সময়ে লিফটের সামনের চত্বর ভরে গিয়েছিল। কোনো সহৃদয় ব্যক্তি নিজের রোগীকে চোখের সামনে রাখার জন্য নতুন রোগীদের জায়গা বানিয়েছেন জবাদের রোগীকে বিছানাসমেত টেনে লিফটের পেছনে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে। তারপরে এমার্জেন্সির ওপর প্রেশার কমে গিয়েছে, সামনের দিকের মাটির বিছানা এক এক করে কমে গিয়েছে, কিন্তু লিফটের পেছনের হতভাগ্যের কথা কারোর মনেই নেই।

তত্ত্বাবধান শেষ করে আমরা সবে আবার এমার্জেন্সি থেকে বেরোচ্ছি, এমন সময় বাইরের ভিড়ে একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। লোকে তড়িঘড়ি সরে গিয়ে একটা ছোটোখাটো মিছিলকে আসার পথ করে দিচ্ছে। আমরা অবাক হয়ে দেখি সেই বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা আসছেন, সঙ্গে কম করে জনা পঞ্চাশেক লোক, অনেকের হাতেই সাদা ফুলের মালা।

আমাদের দেখে পেছন থেকে ছুটে এগিয়ে এল রোগীর ছেলে, যে বলেছিল অসুস্থ বাবার পাশে তার পক্ষে থাকা সম্ভব নয়। বলল, ‘‘আমি দাদাকে নিয়ে এসেছি। ডেডবডি কোথায়?’’

কী ডেডবডি? কার ডেডবডি? আপনার বাবার? তিনি তো বেঁচে আছেন। ‘‘মানে?’’

এইবার রাগে ফেটে পড়ল ছেলে। ‘‘মরেনি মানে? কেন মরেনি? আপনারা যে বললেন, তিন দিন খুব বড়োজোর! আমি দাদাকে নিয়ে এসেছি। দাদা মালা নিয়ে এসেছেন, ও দিকে আমাদের অন্য ছেলেরা আসছে খাট নিয়ে . . . আপনারা তো মহা খচ্চর মাইরি, বললেন বাবা মরে যাবে . . .

‘‘আমি দাদাকে নিয়ে এসেছি। ডেডবডি কোথায়?’’

এর মধ্যে ‘দাদা’ দুলকি চালে হেঁটে চারপাশের লোকেদের বরাভয় দিয়ে আমাদের সামনে পৌঁছে চট করে ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছেন। তিনিই উত্তেজিত ভাইকে সামলালেন, বললেন, ‘‘আহা, তোর বাবা বেঁচে আছেন তো ভালো কথা, তাতে এত রাগ করার কী আছে? ওনারা নিশ্চয়ই ভালো চিকিৎসা করেছেন বলেই খারাপ কিছু ঘটেনি। আচ্ছা, চলুন, দেখে আসি . . .’’

ভিতরে ঢুকে, আর এক চমক—নার্স বাইরের ঘটনার আঁচ পেয়ে এই কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই রোগীকে বেড-এ তুলে দিয়েছেন, তাতে দুধের চেয়েও সাদা চাদর আর নতুন কম্বল . . .

রাজনৈতিক দাদা অজ্ঞান বাবার দিকে তাকিয়ে শ্রদ্ধায় নমস্কার করলেন, তারপরে মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তার এবং ডাক্তারির প্রশংসা করে আশেপাশের লোকেদের উদ্দেশ্যে ছোটোখাটো একটা বক্তৃতা দিয়ে ফেললেন। তারপরে আমাকে আলাদা ডেকে নিয়ে বললেন, ‘‘অবস্থাটা কেমন?’’

সত্যি করেই বললাম, ‘‘খুবই সংকটজনক। সত্যি বলতে কী, আমরা আশাই করিনি এত দিন বাঁচবেন।’’ জবা আর সুনীপাকে ডেকে বললাম, ‘‘এরাই দেখাশোনা করছে, আমি ওদের সিনিয়র মাত্র।’’

উনি গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললেন,, ‘‘হুঁ। আপনাদের কষ্ট সার্থক . . .’’ বলে রোগীর দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘‘ও কি খুব কষ্ট পাচ্ছে’’?

বললাম, ‘‘না, উনি জাগতিক দুঃখকষ্টের ঊর্ধ্বে। প্রাণটুকুই রয়েছে। বাকি কিছুই নেই।’’

জবা বলল, ‘‘এ ক-দিন বাড়ির লোক বলতে কেউ ছিল না, আজই ছেলে ফিরে এল . . . কেউ থাকলে সুবিধা হয় . . .’’

উনি বললেন, ‘‘সে কী ! আমি দেখছি। আপনারা দেখুন, কী করা যায়। আমি আজ কলকাতার বাইরে যাব। তাই আজই ঘুরে গেলাম। ছেলেটা বোকা। আমাকে বলে ডাক্তারবাবু বলেছেন, আজ বাবা মারা যাবেন। আমি ভাবলাম বোধহয় বলতে চেয়েছে বাবা আজ মারা গেছেন। তাই মালা-টালা নিয়ে চলে এসেছি। খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল . . .’’ বলে রোগীর ছেলেকে ডেকে বললেন, ‘‘ডাক্তারবাবুরা বলেছেন, বাবা এখনও খারাপ। জীবনের আশা নেই। আমি আজ রাতে মালদা যাচ্ছি। তুই রোজ বাবার খোঁজ নিবি। আর ছেলেদের বলবি, কেউ যেন থাকে এখানে। বাবা চলে গেলে সব ব্যবস্থা হবে। দেখবি, ডাক্তারবাবুদের যেন কোনো অসম্মান না হয়।’’

উনি চলে গেলেন। পরদিন রোগীও চলে গেলেন। চিরদিনের জন্যই। ডাক্তারবাবুদের অসম্মান হয়নি, তবে জবা আর সুনীপা এর পর বহুদিন বলেছিল, ঠিক সময়ে গিয়ে পৌঁছেছিলাম আমরা। ফুলের মালা নিয়ে যদি তাঁরা আগে গিয়ে পৌঁছোতেন, তাহলে সেদিন মেডিক্যাল কলেজের ইতিহাসে আর একটা ভাঙচুরের ঘটনা লেখা হত, আর তার ঠিক মাঝখানে থাকতাম আমরা। হরি আমাদেরও সে দিন রেখেছিলেন বটে।

শনিবার নাইট ডিউটি থাকলে রবিবার ডে-অফ হত না। বরং রবিবার কাজের চাপ বেশি থাকত। আর রোটেশনে ছ-টায় একটা রবিবারের ডিউটিও করতে হত। তা হলে শনিবারের ডিউটি রবিবার সকাল আটটায় শেষ হয়ে রবিবারের ডিউটি শুরু হত সকাল আটটায়, অর্থাৎ একটানা আটচল্লিশ ঘণ্টা। তাতে রোগীদের অসুবিধে হতে পারে? ম্যানেজমেন্টের বয়েই গেল। রোগী মারা যেতে পারে? তাতেই বা কী এসে যায়? ডাক্তাররা মারধর খেতে পারে, হাসপাতালে ভাঙচুর হতে পারে? হওয়াই উচিত। হতভাগা ডাক্তাররা তো পাশ করেই কোটিপতি। না হয় সেই পথে কিছু মারধর খেলই। আমার ছেলে বা মেয়ে তো না।

নাইট ডিউটির কাঠিন্যের কথা শুনলে তাই আর কষ্ট হয় না। **স্বাস্থ্যের বৃত্তে**

ডা. অনিরুদ্ধ দেব, এমবিবিএস, এমডি, মনোরোগবিশেষজ্ঞ ও সাহিত্যিক।

Advt.

অনীক

‘অনীক’ পত্রিকা বিগত ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে চেষ্টা করেছে সমসাময়িক গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশ হতে। ‘অনীক’-এর বয়োপ্রাপ্তির ইতিহাস তাই সমকালীন গণ-আন্দোলনের চলমান দর্পণও বটে। কোনো বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর মুখপত্র না হয়েও, সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকারে অবিচল থেকে সমকালীন রাজনীতি-অর্থনীতি ও সামাজিক প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে— রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ ছাড়াও গল্প-কবিতা-নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ১৫০ টাকা (সডাক)

অনীক, প্রযত্নে : পিপলস বুক সোসাইটি। ১০/২ বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা - ৭০০০০৯

ফোন—৯৪৩২৮৭৭৫৬০/৯৮৩০১৪৩৩৬৫/৯৪৩৩৭২৪৪৬২

Advt.

উৎস মানুষ

বিজ্ঞান, সমাজ ও সংস্কৃতি

প্রাপ্তিস্থান :

দীপক কুণ্ডু, ২৯/৩, শ্রী গোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা-১২ বই-চিত্র (কফি হাউসের তিন তলা), পাতিরাম, বুক মার্ক, অমর কোলে (বিবাদী বাগ), দিলীপ মজুমদার (ডেকার্স লেন), সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়), সৈকত প্রকাশন (আগরতলা), র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন (বেনিয়াটোলা লেন, কলেজ স্ট্রীট), মনীষা গ্রন্থালয় (কলেজ স্ট্রীট), বইকল্প, ১৮ বি, গড়িয়াহাট রোড (সাউথ), কলকাতা-৭০০০৩১।

যোগাযোগ : ই-মেল- utsamanush1980@gmail.com

১৯৭৯-র ডিসেম্বরে দল্লিরাজহরার ভিলাই স্টিল প্ল্যান্ট হাসপাতালে চিকিৎসক ও সেবিকাদের অবহেলায় প্রাণ হারান লোহা-খনির ঠিকাদারি শ্রমিক কুসুমবাই। প্রসূতি কুসুমবাই ছত্তিশগড় মাইন্স শ্রমিক সংঘের উপাধ্যক্ষা ছিলেন। কুসুমবাইয়ের মৃত্যুতে শ্রমিকরা শপথ নেন নিজেদের এক মাতৃসদন গড়ে তোলার। শেষে মাতৃসদন নয়, গড়ে ওঠে শহীদ হাসপাতাল। আর এক বিশাল জনস্বাস্থ্য আন্দোলন।

কুসুমবাই-সন্দীপ্তাকে মনে রেখে

মেয়েদের স্বাস্থ্যভুবন

ঠিক ৩৩ বছর পর ২০১২-এর ২ ডিসেম্বর চিকিৎসকদের অবহেলায় প্রাণ যায় সাংবাদিক সন্দীপ্তা চ্যাটার্জীর। "সন্দীপ্তাকে মনে রেখে" মহিলাদের স্বাস্থ্যসচেতনতার এক প্রয়াস।

কুসুমবাই ও সন্দীপ্তা যেন এক সূত্রে বাঁধা। তাই *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* পত্রিকায় কুসুমবাই-সন্দীপ্তাকে মনে রেখে "মেয়েদের স্বাস্থ্য ভুবন"।

শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র

এক মডেল যা প্রমাণ করে কম খরচে আধুনিক চিকিৎসা করা সম্ভবপর।

ক্লিনিক চেঙ্গাইল-বেলতলা, উলুবেড়িয়া, হাওড়া

সাধারণ চিকিৎসা, শল্যচিকিৎসা, স্ত্রীরোগ, মনোরোগ, চর্মরোগ, দন্তরোগ, চক্ষুরোগ,

ফিজিকাল মেডিসিন, ফিজিওথেরাপি, ডায়াবেটিক ক্লিনিক,
শেখার অসুবিধা আছে এমন শিশুদের ক্লিনিক, মানস-মন্দিত শিশুদের ক্লিনিক।

কম খরচে

প্যাথোলজি, এক্স-রে, ইসিজি, আল্ট্রাসোনোগ্রাফি, স্পাইরোমেট্রি।

সরকারি হাসপাতালের ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকানের
চেয়েও কম দামে ওষুধের দোকান।

যোগাযোগ ০৩৩-৬৪৫৩১৮২১, ০৩৩-৩২২১৫৬২৮

ওয়েব সাইট www.shramajibiswasthya.org

পরিচালনায়

শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ

কর্ড ব্লাড ব্যাঙ্ক—কাজের না অকাজের?

সরকারি ব্যবস্থায় সর্বজনের হিতার্থে কর্ড ব্লাড ব্যাঙ্ক অবশ্যই কাজের জিনিস। কিন্তু আমাদের দেশে প্রাইভেট উদ্যোগে মা-বাবার কাছ থেকে শিশুজন্মের সময় অনেক অর্থ আদায় করে 'শিশুর ভবিষ্যতের জন্য বিমা' বলে কর্ড ব্লাড-কে বিজ্ঞাপিত করার যে কুনাট্যটি চলছে, তা অবৈজ্ঞানিক ব্যাবসামাত্র—লিখেছেন ডা. কাঞ্চন মুখার্জি।

মহাভারতের গল্প দিয়ে শুরু করা যাক। ধৃতরাষ্ট্র-পত্নী গান্ধারী একটি বিশাল পিণ্ড প্রসব করিলেন। ঋষি দ্বৈপায়ন ব্যাস মহাশয় পিণ্ডটিকে এক-শোটি ভাগে ভাগ করিয়া অত্যন্ত ঠান্ডা প্রকোষ্ঠে কিছু গাছ-গাছড়া এবং ঘৃত সহযোগে দুই বৎসর রাখিয়া দিলেন। জন্ম হইল একশত কৌরবের। মহাভারত-রচয়িতা কী ভেবেছিলেন জানা নেই, তবে সত্তরের দশক থেকে বিজ্ঞানীরা এমন কিছু কোষ-কলার কথা বলে চলেছেন যেখানে থেকে আমাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পুনরুদ্ধার/পুনরুদ্ভাবন সম্ভব। এই ধরনের কোষগুলির নাম 'স্টেম' কোষ (stem cells)। এই স্টেম কোষের একটি বড়ো উৎস হল কর্ড ব্লাড (cord blood)। এবার কিছু অত্যন্ত সাধারণ প্রশ্নের উত্তর জেনে নেওয়া যাক।

কর্ড ব্লাড কী?

সমস্ত স্তন্যপায়ী প্রাণীর ভ্রূণ মাতৃ-জঠরে যুক্ত থাকে একটি 'আমবিলিক্যাল কর্ড' (Umbilical cord—চলতি কথায় 'নাড়ি') মারফত। এর একপ্রান্তে

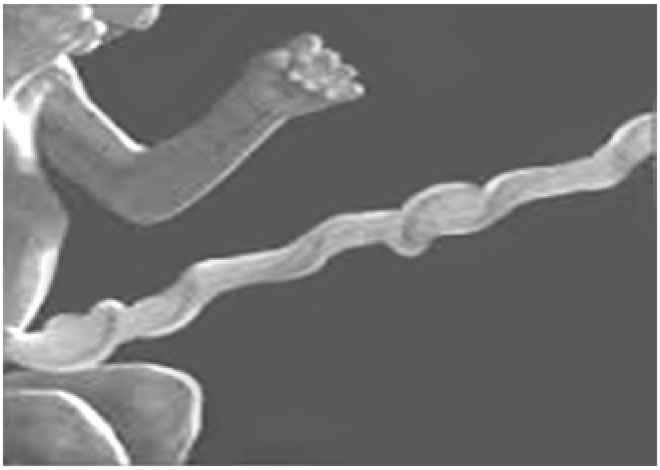

চিত্র ১. নাড়ি বা আমবিলিক্যাল কর্ড

থাকে শিশুর নাভি (Umbilicus)। অন্যপ্রান্তে থাকে প্লাসেন্টা (Placenta—চলতি বাংলায় 'গর্ভফুল' বা শুধুই 'ফুল')। এই আমবিলিক্যাল কর্ড-এ যে রক্ত থাকে তাকেই বলা হয় 'কর্ডব্লাড'। সাধারণভাবে দেখতে গেলে শিশুর জন্মের পরেই কর্ড, ফুল ও তার ভেতরের রক্ত আর কোনো 'কাজে' লাগে না এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এগুলি মেডিক্যাল বর্জ্য হিসেবে ফেলে দেওয়া হয়। এহেন আপাত-অপ্রয়োজনীয় রক্তের মধ্যে থাকে স্টেম কোষ যা কিনা শরীরের বিভিন্ন কোষ-কলায় পরিণত হতে পারার ক্ষমতা ধরে।

চিত্র ২: যেভাবে বেসরকারি কর্ড ব্লাড ব্যাঙ্ক বিজ্ঞাপন দেয়

কর্ড ব্লাড কী কী কাজে লাগতে পারে?

যে যে চিকিৎসায়/কারণে কর্ড ব্লাড আপাতত ব্যবহৃত হচ্ছে তা হল:

- রক্ত সংক্রান্ত সমস্যা: যেমন লিউকেমিয়া, সিকল সেল অ্যানিমিয়া, থ্যালাসেমিয়া।
- বিপাকীয় দ্রব্য সংরক্ষণের রোগ (মেটাবলিক স্টোরেজ ডিজঅর্ডার): যথা হার্লার, সিনড্রোমস। এগুলো খুব বিরল, ফলে এইসব নাম বোধহয় আপনি শোনেননি।
- কিছু কিছু প্রতিরোধ-ক্ষমতার অসুখ (ইমিউন সিস্টেম ডিসঅর্ডার)।

১৯৯৮ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত যত স্টেম কোষ প্রতিস্থাপনের চিকিৎসা হয়েছে তার এক পঞ্চমাংশ হয়েছে শুধুমাত্র লিউকেমিয়া বা ব্লাড ক্যানসার-এর জন্য (**তথ্যসূত্র:** International Bone Marrow Transplantation Registry)।

আধুনিক গবেষণায় স্টেম কোষ চিকিৎসার কাজে লাগানোর আরও অনেক সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। যেমন অ্যালঝাইমারস রোগ, পারকিনসনস রোগ, ডায়াবেটিস ইত্যাদি। তবে এধরনের চিকিৎসা এখনও উচ্চস্তরের গবেষণার পরিসরেই সীমাবদ্ধ বলা যেতে পারে।

কর্ড ব্লাড প্রতিস্থাপন সফল হতে গেলে স্টেম কোষগুলিকে যথাসম্ভব রোগীর নিজস্ব কোষের সমতুল্য হতে হয়। ডাক্তারি পরিভাষায় একে 'HLA Matching' বলা হয়।

কর্ড ব্লাড ব্যাঙ্কিং মানে কী?

কর্ড ব্লাড দীর্ঘদিনের জন্য হিমায়িত অবস্থায় সঞ্চয় করে রাখাকে 'কর্ড ব্লাড ব্যাঙ্কিং' বলা হয়। উদ্দেশ্য কিছু বিরল রোগের চিকিৎসা করা। দু-ধরনের

পরিস্থিতিতে কর্ড ব্লাড ব্যাঙ্কিং-এর ব্যবস্থা করা হয়। প্রথমটি হল নন-ডাইরেক্টেড স্টোরেজ (Non-directed storage)। যে সমস্ত রোগীর অস্থি মজ্জা প্রতিস্থাপন (Bone marrow transplantation) দরকার অথচ তাঁর পরিবারে কোনো সমতুল্য (HLA-Matched) দাতা পাওয়া যাচ্ছে না, তাঁরা এই নন্-ডাইরেক্টেড স্টোরেজ থেকে উপকৃত হন। তাঁদের হিত-সাধনের জন্য অসংখ্য পরোপকারী (altruistic) মাতা-পিতারা সন্তান প্রসবের সময় দান করেন সেই আপাত-অপ্রয়োজনীয় কর্ড-ব্লাড। আর এই অসংখ্য নমুনা নিয়ে তৈরি হবে বিস্তৃত একটি তথ্যভাণ্ডার বা ডেটাবেস (Database)। পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তের মানুষ জানতে পারবেন তাঁর সমতুল্য (HLA-Matched) কর্ড ব্লাড ইউনিট-টি কোন ব্যাঙ্কে সংরক্ষিত আছে। পাঠকবর্গ যেন মোটেই ভাববেন না আমি কোনো অলীক গল্প লিখছি। বিশ্বব্যাপী এ ধরনের তথ্যভাণ্ডার রক্ষা করা হয় Bone Marrow Donors Worldwide (www.bmdw.org)-এ। এটি ১৯৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি ডাচ্ সংস্থা। এখনও পর্যন্ত এটিতে প্রায় সাত লক্ষ কর্ড ব্লাড ইউনিট নথিভুক্ত। প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অপ্রতুল কিন্তু উদ্দেশ্য মহৎ।

এবার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ডাইরেক্টেড স্টোরেজ (Directed storage) প্রসঙ্গে আসি। থ্যালাসেমিয়া, লিউকেমিয়া বা আরও কিছু দুরারোগ্য বিরল বংশগত রোগ থাকলে কোনো কোনো সময় স্টেম কোষ চিকিৎসার কথা বলা হয়। এইরকম পরিস্থিতিতে পরবর্তী শিশুর জন্মের সময় কর্ড ব্লাড ব্যাঙ্কিং করা যেতে পারে। একই পরিবারের সদস্য থেকে পাওয়া নমুনা মানেই তা চিকিৎসা উপযোগী বা সমতুল্য (HLA matched) হবে তার কোনো গ্যারান্টি নেই। তবে এই ব্লাড ওই শিশুর নিজের জীবনে বা তারও পরে জন্ম নেওয়া ভাই/বোনের দরকার লাগলেও লাগতে পারে। যদিও স্টেম কোষ দ্বারা চিকিৎসাযোগ্য কোনো রোগ নেই এধরনের পরিবারে ওই সংরক্ষিত রক্ত ব্যবহারের সম্ভাবনা অত্যন্ত কম।

কর্ড ব্লাড ব্যাঙ্ক কত প্রকারের হয়?

মূলত দুই ধরনের। পাবলিক ও প্রাইভেট। পাবলিক কর্ড ব্লাড ব্যাঙ্ক-এর উদ্দেশ্য হল নন-ডাইরেক্টেড কর্ড রক্ত নিয়ে সকলের জন্য ব্যবহার্য একটি সংগ্রহশালা তৈরি করা। এই ধরনের ব্যাঙ্ক পরিচালনার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করা উচিত সরকারের। কর্ড ব্লাড দান করছেন এরকম পরিবারের কাছ থেকে কোনো অর্থ সাহায্য নেওয়ার প্রশ্নই আসে না। বিশ্বব্যাপী স্টেম কোষ প্রতিস্থাপনের দ্বারা উপকৃত হবেন এরকম ৭০ শতাংশ রোগী তাঁর সমতুল্য (HLA-matched) দাতার অভাবে মারা যান। এই পরিস্থিতির উন্নতি হওয়া সম্ভব তখনই যখন আমরা আরও অনেক অনেক ইউনিট কর্ড ব্লাড পাবলিক ব্যাঙ্কে রাখতে পারব। ভারতবর্ষে সরকারিভাবে এরকম কোনো বৃহৎ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানা নেই। তবে কিছু কিছু বেসরকারি উদ্যোগের কথা শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, চেন্নাই-এর জীবন ব্লাড ব্যাঙ্ক (www.jeevan.org)। তামিলনাড়ু রাজ্য সরকারও এঁদের কিছু সহযোগিতা করেছেন বলে শোনা যায়। পাবলিক ব্যাঙ্কের অপ্রতুলতা এবং সরকারি উদ্যোগের অভাবকে হাতিয়ার করে বেড়ে উঠছে প্রাইভেট ব্যাঙ্কিং সিস্টেম। এদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য বিপুল অর্থের বিনিময়ে একটি সংরক্ষণশালা (storage inventory) গড়ে তোলা; যা হবে শুধুমাত্র ওই ব্যক্তি বা পরিবার-এর সম্পত্তি। সেই পরিবারে কর্ড ব্লাড (Umbilical cord blood UCB) দ্বারা চিকিৎসাযোগ্য কোনো রোগ না থাকলে এই ব্লাড ব্যবহারের সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া কঠিন হলেও দেখা গেছে বাচ্চার দশ বছর বয়স অবধি নিজের জন্য এই ব্লাড ব্যবহারের সম্ভাবনা প্রতি দশ হাজার থেকে দুই লাখের মধ্যে মাত্র একজন (তথ্যসূত্র: Sci Am 2001; 284: 42-9 এবং Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada Clinical Practice Guidelines)। পরবর্তী প্রশ্ন আসে UCB সঞ্চয়ের মেয়াদকাল নিয়ে। এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়া সহজ নয়। তবে বেশির ভাগ প্রাইভেট ব্যাঙ্কই ১৫ থেকে ২০ বছর অবধি ব্যবহারযোগ্য সঞ্চয়ের প্রতিশ্রুতি দেয়, কয়েকটি ব্যাঙ্ক সংস্থা অবশ্য আজীবন ব্যবহার-যোগ্যতার কথা বলে থাকে। ভারতবর্ষে এই মুহূর্তে ১৫ থেকে ২০টা প্রাইভেট ব্যাঙ্ক প্রচলিত যাঁরা UCB পদ্ধতিটিকে একটি বিমা (insurance)-র মতো করে প্রচার ও 'চেতনাবৃদ্ধি'-র কাজ করেন। এই বিমায় সঠিক দাবির সম্ভাবনা প্রতি দশহাজার জনের মধ্যে এক জনের বা তার কম কিন্তু প্রিমিয়ামের মূল্য অনেক (ইউনিট পিছু পঞ্চাশ হাজার টাকা থেকে এক লক্ষ)। আর এরকম অতি খরচ সাপেক্ষ একটি 'বিমা' তাঁরা করানোর প্রচেষ্টায় সম্ভাব্য পিতা-মাতার আবেগে সযত্নে সুড়সুড়ি দেন। এর বিজ্ঞাপনের স্লোগানগুলোও খুব আকর্ষণীয়। যেমন ''unimaginable possibilities, ''freezing a spare immune system'' ''once in a lifetime opportunity''—বাংলায় বললে ''অকল্পনীয় সম্ভাবনা'', ''হিমায়িত একটি অতিরিক্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থা'', ''জীবনে এ সুযোগ একবারই আসে।''

ভারতবর্ষে কোনো নিয়ামক সংস্থা আছে কি?

আমাদের দেশে এই দায়িত্ব বর্তায় Central Drugs Standards Control Organisation (CDSCO)-সিডিএসসিও-এর ওপর। ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) এবং ডিপার্টমেন্ট অফ বায়োটেকনোলজি (ডিবিটি) যৌথভাবে প্রকাশ করেন ''National Guidelines for Stem Cell Research'' এই নথিটির প্রাক্কথন পড়লেই বুঝতে পারবেন তাঁরা পূর্ব প্রকাশিত সংস্করণের (২০০৭) শিরোনাম থেকে 'চিকিৎসা' বা 'Therapy' শব্দটি বাদই দিয়ে দিয়েছেন। এখনও পর্যন্ত স্টেম কোষ কোনো প্রামাণ্য চিকিৎসার অংশ নয়, সেটা জোর দিয়ে বোঝাতেই 'থেরাপি' কথাটা বাদ দেওয়া। যেটার কার্যকারিতা আদৌ প্রমাণিত নয় তার প্রয়োগের নীতি বা গাইডলাইনের প্রশ্নই ওঠে না। রক্তের বিভিন্ন কোষ তৈরি করার কাজ বাদে কোনো রোগীর ওপর স্টেম কোষের ব্যবহার তাঁর ওপর পরীক্ষানিরীক্ষা করার শামিল। ওই নথিতে মোটা হরফে লেখা রয়েছে।

'. . . any stem cell use in patients must only be done within the purview of an approved and monitored clinical trial with the intent to advance science and medicine, and not offering it as therapy. In accordance with this stringent definition, every use of stem cells in patients outside an approved clinical trial shall be considered as malpractice.' অর্থাৎ, কোনো রোগীর ওপর স্টেম কোষের ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া

যেতে পারে সেই কাজটি 'ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল' হিসেবে ধরে যথাযথ নজরদারির ব্যবস্থা করে তবেই; তাকে 'চিকিৎসা' বলে চালানো যাবে না; বিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিদ্যার অগ্রগতির কাজে লাগবে, এমনই বলতে হবে। এই কড়া সংজ্ঞা অনুসারে, যথাযথ অনুমতিপ্রাপ্ত ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল-এর বাইরে স্টেম কোষের ব্যবহার হল অপচিকিৎসা (Malpractice)।

২০১৩-তে প্রকাশিত এই জাতীয় গাইডলাইনে বলা রয়েছে 'there are ethical concerns about the promotional advertisements by private banks offering storge of cord blood for possible future use. Such advertisements are often misleading for the public and lack comprehensive and accurate information to the consumer. It may be mentioned that there is no scientific basis for prservation of cord blood for future self-use and this practice is not recommended. On the other hand, parents should be encouraged for voluntary donation to public cord blood banks for allogenic transplantation and research purposes. (তথ্যসূত্র: *National Guidelines for Stem Cell Research* 2013 Page 21`, Section 12.2.2.)

বাংলায় তর্জমা করলে দাঁড়ায়— ''ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য কর্ড ব্লাড সংরক্ষণ নিয়ে প্রাইভেট ব্যাঙ্কগুলো যে বিজ্ঞাপনী কায়দা নিচ্ছে তার নৈতিকতা প্রশ্নাতীত নয়। এই বিজ্ঞাপনগুলো সাধারণ মানুষকে ভুল পথে পরিচালনা করছে ও ক্রেতার প্রাপ্য সামগ্রিক ও সঠিক তথ্য দিচ্ছে না। এখানে এটা উল্লেখ করা দরকার, ভবিষ্যতে নিজের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কর্ড ব্লাড সংরক্ষণের কোনো বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি নেই, এবং এটা করতে বলা যায় না।

অন্যদিকে মা-বাবাদের পাবলিক কর্ড ব্লাড ব্যাঙ্কে স্বেচ্ছায় শিশুর কর্ড ব্লাড দান করতে উৎসাহ দেওয়া উচিত [এবং এর জন্য মা-বাবার কাছ থেকে অর্থ আদায়ের প্রশ্নই নেই]। এই কর্ড ব্লাড অন্যের দেহে অঙ্গ প্রতিস্থাপন ও চিকিৎসা-গবেষণার কাজে লাগবে।"

যুক্তরাজ্য (UK) এবং যুক্তরাষ্ট্রে (USA) কর্ড ব্লাড ব্যাঙ্কিংকে জীবনবিমা হিসাবে বিজ্ঞাপিত করা আইনবিরুদ্ধ।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফডিএ) কেবলমাত্র রক্তের রোগের চিকিৎসায় কর্ড ব্লাড ব্যবহার অনুমোদন করেছে। ইটালি ও ফ্রান্সে প্রাইভেট কর্ড ব্লাড ব্যাঙ্ক করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। আমেরিকার 'অ্যাকাডেমি অফ পেডিয়াট্রিক্স' ও কানাডার 'সোসাইটি অফ অবস্ট্রেটিশিয়ানস অ্যান্ড গাইনোকোলজি' বলছে, প্রাইভেট ব্যাঙ্ক বিমার মতো করে কর্ড ব্লাড রাখার জন্য পয়সা নিতে পারবে না, কিন্তু তারা মা-বাবার কাছ থেকে অর্থ না নিয়ে কর্ড ব্লাড ব্যাঙ্ক করলে সেটা সমর্থনযোগ্য—শিশুর ভবিষ্যতে সেই কর্ড ব্লাড নিতে হলে তখন তার জন্য টাকা দিতে হবে।

কর্ড ব্লাড কার সম্পত্তি—মায়ের না শিশুর?

এই সংক্রান্ত কোনো মামলা হয়েছে কিনা জানা নেই, কিন্তু প্রশ্নটির উত্তর খুব একটা সহজ নয়। একাধারে কর্ড ব্লাড জৈবিকভাবে, উৎপত্তিগতভাবে এবং জিনগতভাবে (Biologically, Developmentally and Genetically) শিশুরই সম্পত্তি। অন্য দিক থেকে দেখলে এটা মায়ের সম্পত্তি বলে মনে হতে পারে। কারণ জন্মের অব্যবহিত পরই কর্ড বা নাড়ি কেটে দেওয়ার পর যেখান থেকে রক্ত সংগ্রহ করা হয় সেটি তো মায়ের শরীরের সঙ্গে যুক্ত থাকে। সুতরাং ওই রক্তের ওপর মায়ের অধিকার থাকাই তো স্বাভাবিক। ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, মা তাঁর সদ্যোজাত সন্তানকে এটি একটি উপহার হিসেবে দিলেন বা পরিবারে যদি অন্য কোনো অসুস্থ সন্তান থাকে তার ভালোর জন্য উনি এ কাজ করলেন। পাবলিক ব্যাঙ্কে দান করার সময় ধরে নেওয়া যেতে পারে তিনি সমাজের বৃহত্তর হিতসাধনের জন্য এই সিদ্ধান্ত নিলেন।

পরিশেষে পাঠকের সুবিধার্থে কয়েকটি কথা সংক্ষেপে বলি—

❖ আমবিলিক্যাল কর্ড ব্লাড হল স্টেম কোষের একটি উচ্চমানের উৎস যা দিয়ে কিছু কিছু ব্লাড ক্যানসার, থ্যালাসেমিয়া ইত্যাদি রোগের চিকিৎসা সম্ভব।

❖ স্টেম কোষের অন্য উৎস হল আমাদের অস্থিমজ্জা (bone marrow)।

❖ কর্ড ব্লাড দিয়ে চিকিৎসা সম্ভব এরকম কোনো রোগ পরিবারে কারও থাকলে পরবর্তী শিশুর জন্মের সময় আমবিলিক্যাল কর্ড ব্লাড সংরক্ষণের কথা অবশ্যই ভাবা উচিত।

❖ পরিবারে এধরনের কোনো রোগ না থাকলে (অর্থাৎ রিস্ক কম যে পরিবারে) শুধুমাত্র শিশুর নিজের সম্ভাব্য ব্যবহারের কথা মাথায় রেখে কর্ড ব্লাড সংরক্ষণ করার যৌক্তিকতা নিয়ে বড়ো প্রশ্ন রয়েছে।

❖ কর্ড ব্লাড বা অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে টিস্যুগত সামঞ্জস্য (HLA matching) একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

❖ অ্যামবিলিক্যাল কর্ড ব্লাড ভবিষ্যতে আরও অনেক রোগের চিকিৎসার কাজে লাগতে পারে। তার জন্য দরকার সরকারি বা পাবলিক ব্যাঙ্ক মারফত একটি বৃহৎ তথ্যভাণ্ডার তৈরি করা।

❖ প্রয়োজন না থাকলে, শুধুমাত্র 'লাইফ ইনসিওরেন্স'-এর জন্য এত খরচসাপেক্ষ একটি বিমা পলিসি ক্রয় করার মতো সময় এখনও আসেনি।

❖ সুযোগ পেলে সরকারি তথা পাবলিক কর্ড ব্লাড ব্যাঙ্কে (Public Cord Blood) শিশুর জন্মের সময় রক্ত দান করুন। এই 'দান' কোনো দিন কারও কাজে লাগতে পারে। **স্বাস্থ্যের বৃত্তে**

ডা. কাঞ্চন মুখার্জি, এমবিবিএস, এফআরসিওজি, একজন স্ত্রীরোগ ও ধাত্রী বিদ্যা বিশেষজ্ঞ। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

সাধভক্ষণ

দিলীপ ঘোষ

''জেন্ডার স্টাডিস!'' ''সেটা কী বস্তু?'' ''জানেন না? মেয়েদের যেসব আলাদা সমস্যা আছে তাই নিয়ে যে বিদ্যাচর্চা সেটা।'' ''ও! ছেলেদের জেন্ডার হয় না বুঝি?'' ''রেসিয়াল স্টাডিস পড়ি,'' বলল আমেরিকা প্রবাসী ছেলেটি। ''সেটা কী বাবা?'' ''এই যেমন ধরুন আফ্রিকান আমেরিকান, তারপরে এশিয়ান, এদের বিষয়ে পড়াশোনা আর কী!'' ''ও সাহেবরা বুঝি রেস' নয়?'' এই সব শব্দ ভারি অবাক করে আমাকে!

পাড়ার রেস্তোরাঁ একখানা হ্যান্ডবিল ছেড়েছিল। নানা খাবারের তালিকা। শেষের দিকে বিশেষ আনুষ্ঠানিক মেনু। সব একই ফন্টে পরপর ছাপা। অতএব না জানা থাকলে বোঝার উপায় নেই কোনটা অনুষ্ঠানের নাম আর কোনটা খাবার। একটানা পড়ে গেলে এরকম: বউ-ভাত, রাধাবল্লভী, কাশ্মিরী আলুরদম, পোলাও, অন্নপ্রাশন, পায়েস, ফিশফ্রাই, সাধভক্ষণ ইত্যাদি। এক পেটুক শ্রীমান গভীর মনেযোগ দিয়ে পড়ছিল মেনুটা। সেটা আপাদমস্তক ভালো করে আত্মস্থ করে বলল, ''সবই তো খেয়েছি, কেবল এই 'সাধভক্ষণ' আইটেমটা ছাড়া।'' সবাই কিছুক্ষণের জন্য নির্বাক, তারপরেই প্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া অপ্রস্তুত শ্রীমানের প্রতি অজস্র 'আওয়াজ' বর্ষণ।

কনে দেখা, বউভাত, অন্নপ্রাশন, সবই নারী পুরুষ একসঙ্গে উদ্‌যাপন করে, কিন্তু মা হওয়ার ঠিক আগের অনুষ্ঠানটি কেবল 'মেয়েলি' পরব হয়ে আছে কেন জানি না? এই অনুষ্ঠানটিকে পুরুষবর্জিত রেখে কি মহিলাদের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত হল? মেয়েদের এই ''নিজস্ব'' জায়গা কী মেয়েরা নিজেই তৈরি করেছেন?

সাদাসাপটা হ্যাঁ বা না-এ উত্তর দেওয়া মুশকিল। জন্ম দেওয়া দীর্ঘদিন ধরেই আমাদের সমাজে 'অশুচি'। কিছুদিন আগেও পুরুত মশাইরা কোনো বাড়িতে শিশু জন্মালে বলতেন 'অশৌচ' চলছে ওদের বাড়িতে। বাড়ির বাইরে, সবচেয়ে অস্বাস্থ্যকর ঘরটিতেই এই অশুভ কম্মটি করতে হত মায়েদের। পুরুষ মানুষরা খরচাপাতি বহন করতেন। ভারতের নার্সিং-এর ইতিহাস একটু ঘাঁটাঘাঁটি করে দেখেছি সম্রাট অশোকের আমলে যখন বৌদ্ধধর্ম রাষ্ট্রীয় ধর্ম হয়ে ওঠে সেই সময়েই ব্যক্তিগত 'চিকিৎসা' থেকে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে 'জনস্বাস্থ্য' ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। তাঁর আমলেই প্রাক প্রসব এবং প্রসবোত্তর পরিষেবার বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থার কথা লিপিবদ্ধ আকারে পাওয়া যায়। অশোকের উত্তরাধিকারী সম্রাট বুদ্ধদাস একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাই চালু করে ফেলেছিলেন। বৌদ্ধদের হটিয়ে যখন ব্রাহ্মণ্যধর্ম জাঁকিয়ে বসল, তখন স্বাস্থ্যব্যবস্থা আর সংস্কৃতির অচ্ছেদ্য অঙ্গ থাকল না। ধাত্রীবিদ্যাসহ চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়টাই আর গৌরবজনক বিদ্যার মান্যতা পেল না। ধাত্রীরা ক্রমশ অন্ত্যজ হয়ে উঠলেন। জন্মানো অশুচি ঘটনা হয়ে উঠল। সেইদিন আর অবশ্যই নেই। মা হওয়ার ঝুঁকি কমেছে, কিন্তু লিঙ্গসাম্য আনার বড়ো 'লড়াই' শেষ হতে এখনও অনেক বাকি।

বস্তুত মেয়েদের নিজেদের অধিকার অর্জনের যা কিছু করতে হয়েছে দীর্ঘদিন সেটাকে 'যুদ্ধ' অথবা 'লড়াই'-এর রূপকল্পেই ভাবা হয়েছে। যে জটিল আর্থ-সামাজিক মিথস্ক্রিয়ায় মেয়েদের 'অধীন' করে রাখা হয়েছে, সেটাকে সরল ভাষ্যে পুরুষতন্ত্র বলেই চিহ্নিত করা হয়। পুরুষ সেখানে প্রতিপক্ষ, শত্রু। ভাবনাটা গত শতকের শেষ দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এরকমই ছিল। ১৯৯৪ সালে আন্তর্জাতিক জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সম্মেলন হয়েছিল কায়রোতে, তার পরের বছর ১৯৯৫-এ বিশ্ব নারী সম্মেলন হয়েছিল বেজিং-এ। মেয়েদের অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়টা একটা নতুন বাঁক নিল সেখানে। স্থির হল পুরুষদের সঙ্গে নিয়েই এগোতে হবে। কিন্তু কীভাবে? সর্বস্তরে সর্বক্ষেত্রে আধিপত্য পুরুষদের, সেই আধিপত্যকে কাজে লাগাতে গেলে কী পুরুষতন্ত্রের প্রতিরূপকটিই আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে না? পুরুষরা কী সত্যিই স্বেচ্ছায় জায়গা ছেড়ে দেবেন মেয়েদের, তাঁদের নিজেদের স্বার্থে আঘাত লাগলেও? তেমনটি হতে দেখা গেছে কি কখনো? অনেক তর্ক, যুক্তি ও প্রতিযুক্তি, ধুলো ছোঁড়াছুঁড়ি করে স্থির হয়েছিল আজকের এই ত্যাগের পেছনে তাঁদের আগামী দিনের লাভের অঙ্ক বুঝিয়েই সঙ্গী করতে হবে পুরুষদের। লিঙ্গবৈষম্য দূর করতে পুরুষদের ভূমিকা নির্দিষ্ট করতে গিয়ে যে কাজগুলিতে পুরুষদেরও বিশেষ ভূমিকা একান্ত দরকার বলে স্থির হয়েছিল সেগুলি হল—

১. মেয়েদের বিরুদ্ধে পারিবারিক ও সামাজিক হিংসার প্রতিরোধ গড়ে তোলা,

২. সর্বস্তরে শিক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণ বাড়ানো (অনেক সময়ে প্রচলিত সিলেবাসের ভেতরে সযত্নে রোপিত পুরুষতান্ত্রিক পাঠ্য পালটানোর মতো কঠিন কাজও তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে),

৩. পরিবারের সদস্যদের লালন এবং পালনে বড়ো ভূমিকা নেওয়া, রাষ্ট্রকে এই ধরনের নীতি গ্রহণ করতে প্রণোদিত করা,

৪. মহিলাদের অর্থনৈতিক কাজকর্মে অংশগ্রহণ বাড়ানো, আর

৫. প্রজনন ও শিশু স্বাস্থ্যের মান উন্নত করে তোলা।

ছোট্ট তালিকা, কিন্তু অত্যন্ত জটিল ও এবং দুরূহ। এদের পারস্পরিক সম্পর্কও খুব নিবিড় যদিও সেগুলো যে সব খুব স্পষ্টভাবে বোঝা গেছে এমন নয়। যেমন ধরা যাক মা আর শিশুদের স্বাস্থ্য, স্বাভাবিকভাবেই সেটা বহুলাংশে তাদের পুষ্টির অবস্থার ওপর নির্ভর করে, কিন্তু পুষ্টির সঙ্গে পারিবারিক হিংসারও একটা সম্পর্ক দেখতে পাচ্ছেন গবেষকরা। এর কার্যকারণ এখনও খুব স্পষ্ট নয় যদিও।

উন্নত দেশগুলো, যেখানে মা হতে গিয়ে প্রাণ যায় কম মায়ের, শিশু মৃত্যুর হারও কম, সেখানে গত শতকের ষাট সত্তরের দশক থেকেই প্রাক-প্রসব এবং প্রসবোত্তর প্রশিক্ষণে যুক্ত করা শুরু হয়েছিল বাবাদের। মায়েদের গর্ভধারণকালীন, এবং শিশুর জন্মের পরের জটিলতার মোকাবিলা করার নানা প্রকৌশল শিখে তাঁদের সাহায্য করার শিক্ষা ছিল সেই সব প্রশিক্ষণের মুখ্য বিষয়। এখন পশ্চিম ইউরোপ এবং স্ক্যান্ডিনেভিয় দেশগুলোতে এটা প্রায় সর্বজনীন। ১৯৯৭-এর একটা গবেষণাপত্রে দেখছিলাম ১৯৯৫ সালে পিতা হয়েছেন যাঁরা তাঁদের নিয়ে একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে এঁদের ৯৫ শতাংশ জন্মের সময়ে লেবার রুমে উপস্থিত

ছিলেন। ২০০৫-এর ডেনমার্কের অন্য একটি সমীক্ষায় দেখছিলাম যে ৮৮ শতাংশ বাবারা জন্ম-প্রস্তুতির প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন।

কী লাভ এটা করে? এতে কি গর্ভযন্ত্রণা কমে? মা হওয়ার ঝুঁকি কমে? বিদেশে সমীক্ষাগুলিতে মায়েদের কাছেই রাখা হয়েছিল প্রশ্নগুলি। তাঁরা বলেছিলেন ভাবী সন্তানের জনক পাশে আছেন, পুরো প্রক্রিয়ায় সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছেন এটা জানলে স্ট্রেস কমে, দুশ্চিন্তা কমে, ব্যথার অনুভূতি কমে। প্রসবোত্তর ডিপ্রেশনের সম্ভাবনাও কমে। এ ছাড়াও গবেষকরা একটা অপ্রত্যক্ষ্য সম্পর্ক পাচ্ছেন প্রসব পর্বে বাবার সক্রিয় ভূমিকার সঙ্গে মায়ের শারীরিক অবস্থার। আর বাবারা বলছেন যে এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকার ফলে শিশুটির সঙ্গে জন্মের আগে থেকেই একটা বন্ডিং হয়ে যাচ্ছে তাঁদের। প্রথম থেকে পুরো প্রক্রিয়ার জটিলতা বুঝে যাওয়ার ফলে মায়েদের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি কমছে। কিন্তু সমস্যা আছে বাবাদেরও। তাদের অনেকেরই নালিশ যে প্রশিক্ষণগুলি বেশির ভাগ সময়েই মা-কেন্দ্রিক, বাবাদের উৎকণ্ঠার বিষয়গুলি ঠিকভাবে বিবেচিত হয় না, তাঁদের অজ্ঞতার কথা মাথায় না রেখেই পাঠক্রমগুলি তৈরি করা হয়। ইংল্যান্ডের আরেকটু পুরোনো একটি সমীক্ষায় দেখেছি, যেসব বাবারা লেবাররুমে উপস্থিত থেকে জন্ম দেওয়ার প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁরা অনেকে বলেছেন যে, ডেলিভারি দেখেই তাঁরা নার্ভাস হয়ে পড়ছেন, স্ট্রেস সামলাতে কষ্ট হচ্ছে। আমাদের দেশের অভিজ্ঞ নার্সদের কাছে শুনেছি সদ্য পাশ করে আসা তরুণ ডাক্তারবাবুরা ডেলিভারি সামলাতে গিয়ে কী রকম নার্ভাস হয়ে পড়েন প্রথমদিকে।

মেয়েদের ব্যাপার-স্যাপার থেকে ছেলেদের আলাদা রাখতে সমাজের একটা অংশ সবসময়েই 'উৎসাহী' থাকবে। এই একই 'উৎসাহ' আলাদা করে রাখে ভিন্ন পছন্দের মানুষের, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের, ভিন্ন জাতিদের। এই উৎসাহের বলি হয় নির্ভয়ারা, উত্তর ভারতে পড়তে কিংবা কাজ করতে যাওয়া উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীরা, সমকামী-রূপান্তকামীরা। এই বহিষ্করণের রাজনীতি কখনো ধর্মীয় অনুশাসনের আশ্রয় নেয়, কখনো ''পৌরুষ''-এ সুড়সুড়ি দেয়, কখনো সমাজকে সুস্থ রাখার জন্য তথাকথিত 'অসুস্থ'দের গণধোলাই দেয়। কেবল মেয়েরা নয়, কেবল সমকামীরা নয়, কেবল ভিন্ন আকৃতির মানুষরা নন, পুরুষদের একটা বড়ো অংশও এই ''পুরুষতন্ত্রের'' শিকার হয়ে ওঠেন। 'মেয়েলিপনা বিরোধিতা'-কে মান্যতা দিয়ে তাঁদের নিজেদের ভবিষ্যৎ জলাঞ্জলি দেওয়ার ষড়যন্ত্রে অজান্তেই জড়িয়ে পড়েন তাঁরা।

মেয়েদের একান্ত স্পেসের মিথটা ভাঙার দায়িত্ব না হয় মেয়েরাই নিলেন, শুরু করা যেতে পারে পুরুষদের 'সাধভক্ষণে' নিমন্ত্রণ পাঠিয়ে।

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

দিলীপ ঘোষ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্যদপ্তরে উচ্চপদে কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে প্রতীচী ইনস্টিটিউটে কর্মরত।

তথ্যসূত্র:

১. Lars Plantina, Adepeju Aderemi Olukoya & Pernilla Ny; Positive Health Outcomes of Fathers' Involvement in Pregnancy and Childbirth Paternal support : A Scope Study Literature Review; *Fathering*, Vol. 9, No.1, Winter 2011, 87-102. © 2011 by the Men's Studies Press, LLC

২. Maggie Redshaw* and Jane Henderson; Fathers' engagement in pregnancy and childbirth: evidence from a national survery, BMC Pregancy and Childbirth 2013, 13:70 http://www.biomedcentral.com/1471-2393/13/70

৩. MenEngage in Collaboration with UNWOMEN and in support of UNFPA; Men, Masculinities and Changing Power: A discussion paper on engaging men in gender equality from Beijing 1995 to 2015.

Advt.

এখন **দুর্বার ভাবনা** পাওয়া যাচ্ছে

শিলিগুড়িতে বুকস, কুচবিহারে পার্থ লাহিড়ী, এন এইচ রোড, নবদ্বীপের পোড়ামাতলায় সুজয়া প্রকাশনী, পশ্চিম মেদিনীপুরের ভূর্জপত্র (বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি রোড), শান্তিনিকেতনে সুবর্ণরেখা।

কলকাতায়

হাওড়া স্টেশন (কলকাতা বাসস্ট্যান্ড, হাওড়া বাসস্ট্যান্ড), শিয়ালদহ স্টেশন (সানশাইন বুকস্টল, রামকৃষ্ণ পুস্তকালয় ও অন্যত্র), কলেজ স্ট্রিট (পাতিরাম, বুকমার্ক, মণীষা গ্রন্থালয়, বইচিত্র ও অন্যত্র)।

রাসবিহারী মোড়, ফুলবাগান (বেলেঘাটা), হাতিবাগান, শ্যামবাজার (পাঁচমাথার মোড়), ঢাকুরিয়া (দক্ষিণাপণের বিপরীতে), বইকল্প (দোতলায়), বিধাননগর (উল্টোডাঙা) স্টেশন ও অন্যত্র।

যাঁরা পত্রিকার এজেন্সি নিতে চান এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন— ১২/৫ নীলমণি মিত্র স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৬।

অথবা ফোন করুন ০৮৪২০০৬৬৫৯৪ অথবা ০৩৩২৫৪৩৭৫৬০।

মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার

কোড অফ এথিক্স রেগুলেশন, ২০০২

(চতুর্থ ও শেষ অংশ)

২০০২ সালে মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া (Medical Council of India) ডাক্তারদের অবশ্যপালনীয় একটি 'কোড অফ এথিক্স' তথা 'আচরণবিধির বিধিবদ্ধ আইনসমূহ' জারি করে। তারপর তার কিছু সংশোধন হয়। এখানে আমরা ২০১০ সাল ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সমস্ত সংশোধন সমেত সেই কোডের অনুবাদের চতুর্থ ও শেষ অংশ পেশ করছি। আইনি বিষয় অনুবাদে ভুল-ত্রুটি খুব বড়ো অসুবিধা হয়ে দেখা দিতে পারে, তাই পাঠকদের কাছে অগ্রিম অনুরোধ, এই লেখাটিকে জনচেতনা বৃদ্ধির এক ক্ষুদ্র প্রয়াস বলেই মনে করবেন, এবং আইনি কোনো ব্যবস্থা নেবার আগে ইংরাজিতে লেখা মূল আইনটি দেখে নেবেন। ইন্টারনেটে এই আইনটি ইংরাজিতে পাওয়া যায় মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া-র ওয়েবসাইটে; আমরা এটি পেয়েছি http://www.mciindia.org/RulesandRegulations/CodeofMedicalEthicsRegulations2002.aspx থেকে।

'মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া' (Medical Council of India) বা সংক্ষেপে এমসিআই হল ভারতের সমস্ত ডাক্তারদের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। এখানে 'ডাক্তার' বলতে আধুনিক চিকিৎসার ডাক্তারদের (লোকমুখে যা অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা বলে সমধিক পরিচিত) কথা বুঝতে হবে, অন্যান্য ধারার চিকিৎসক, যথা আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক, তাঁদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া-র নেই।

ভারতে (আধুনিক) ডাক্তারি শিক্ষাব্যবস্থার মান স্থির করা ও তা বজায় রাখা মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া-র অন্যতম কাজ। দেশে-বিদেশে বিভিন্ন কলেজ-ইউনিভার্সিটি প্রদত্ত ডাক্তারি ডিগ্রি-ডিপ্লোমা ভারতে আইনি মান্যতা পাবে কিনা সেটাও এমসিআই ঠিক করে। ডাক্তারি প্র্যাকটিস করার মান নির্ধারণ করে জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দায়িত্বও এই সংস্থারই।

মেডিক্যাল কাউন্সিল-এর একটা আইনি ভূমিকা রয়েছে। কোনো ডাক্তার তাঁর কর্তব্য ঠিকভাবে পালন করছেন কিনা সেটা দেখার প্রাথমিক আইনি দায়িত্ব মেডিক্যাল কাউন্সিল-এরই। ক্রেতা সুরক্ষা আদালত বা সাধারণ আদালতে মেডিক্যাল কাউন্সিল ডাক্তারির যে মান নির্ধারণ করে দিয়েছে, মোটামুটি সেই মানই বিচারের ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়। তাই মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া-র 'কোড অফ এথিক্স রেগুলেশন' ডাক্তার ও রোগী—দু-জনের ক্ষেত্রেই অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। এই গুরুত্ব বিবেচনা করে আমরা সেই কোডের অনুবাদ প্রকাশ করছি। এই সংখ্যায় তার চতুর্থ ও শেষ অংশ। আইনি বিষয় অনুবাদে সামান্য এদিক-ওদিক খুব বড়ো অসুবিধা হয়ে দেখা দিতে পারে, তাই পাঠকদের কাছে অগ্রিম অনুরোধ, এই লেখাটিকে জনচেতনা বৃদ্ধির এক ক্ষুদ্র প্রয়াস বলেই মনে করবেন, এবং আইনি কোনো ব্যবস্থা নেবার আগে ইংরাজিতে লেখা মূল আইনটি দেখে নেবেন, সেটি ইন্টারনেটে লভ্য।

৭. অসদাচরণ

নিম্নলখিত কাজগুলো করা হলে (বা, প্রয়োজনীয় কাজ করা না হলে) তা চিকিৎসকের পেশাদারি অসততা বা অসদাচরণ বলে ধরা হবে, ও তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৭.১. আইন লঙ্ঘন: যদি কোনো চিকিৎসক কোনোরকম আইন লঙ্ঘন করেন।

৭.২. যদি চিকিৎসক তাঁর রোগীর সমস্তরকম তথ্য ৩ বছর পর্যন্ত নথিভুক্ত করে না থাকেন (১.৩ ধারা মোতাবেক), ও রোগী বা তাঁর আইনি প্রতিনিধি যদি ওই নথি পাবার অনুরোধ করেও ৭২ ঘণ্টার মধ্যে তা না দেন (১.৩.২ ধারা মোতাবেক)।

৭.৩. ডাক্তার যদি স্টেট মেডিক্যাল কাউন্সিল বা মেডিক্যাল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া থেকে প্রাপ্ত রেজিস্ট্রেশন নম্বর তার ক্লিনিকে, ব্যবস্থাপত্রে (প্রেসক্রিপশনে) এবং সার্টিফিকেটে না দেন, তবে তিনি নির্দিষ্ট আইনিধারা (১.৩.২.) লঙ্ঘন করবেন।

৭.৪. ব্যাভিচার ও অশোভন আচরণ: কোনো রোগীর সঙ্গে কোনো চিকিৎসক কোনোরকম অশোভন আচরণ বা ব্যাভিচার করেন তাহলে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিল অ্যাক্ট ১৯৫৬ বা স্টেট মেডিক্যাল কাউন্সিল অ্যাক্ট-এর আইন অনুসারে সেই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৭.৫. আদালতের আইনানুসারে দণ্ডাজ্ঞা: বে-আইনি কাজ, ভ্রষ্টাচার বা অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লে আদালতের আইনানুসারে দণ্ডাদেশ দেওয়া হবে।

৭.৬. লিঙ্গ নির্ধারণ পরীক্ষা: মেডিক্যাল টার্মিনেশন অব প্রেগন্যান্সি অ্যাক্ট, ১৯৭১-এ নির্দিষ্টভাবে ভ্রূণ নষ্ট হওয়ার যেসব কারণ বলা আছে সেগুলো ছাড়া লিঙ্গ নির্ধারণ পরীক্ষা, যা মায়ের গর্ভে বেড়ে ওঠা কন্যাভ্রূণ নষ্ট করার জন্যই ব্যবহৃত হয় তা করা চলবে না। গর্ভাবস্থায় স্বাভাবিকভাবে

বেড়ে ওঠা কন্যা ভ্রূণকে নষ্ট করা কন্যাভ্রূণ হত্যারই শামিল এবং এটিকে চিকিৎসক বা ডাক্তারের পেশাগত অপকর্ম হিসেবেই বিবেচনা করা হবে ও তার পাশাপাশি আইন অনুযায়ী ফৌজদারি মামলা করা হবে।

৭.৭. পেশাদারি সার্টিফিকেট, রিপোর্ট এবং অন্যান্য নথিতে সই: একজন রেজিস্টার্ড চিকিৎসক বা ডাক্তার কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে তাঁদের পেশাদার ক্ষমতার বলে সময়ে সময়ে প্রশাসন বা আদালতের অনুরোধে সার্টিফিকেটে, নোটিফিকেশনে, রিপোর্টে বা এইরকমই আরও বিভিন্ন নথিতে তাঁর স্বাক্ষর দিতে আইন মোতাবেক দায়বদ্ধ। অ্যাপেনডিক্স-এ তাঁদের কোন কোন নথিতে স্বাক্ষর করা দরকার তার এক তালিকা আছে। ভুল, জাল বা ভুল বোঝানো কোনো সার্টিফিকেট, নোটিফিকেশন, রিপোর্ট বা এই ধরনের কোনো নথিতে যদি কোনো রেজিস্টার্ড ডাক্তার সই করেন তবে রেজিস্টার থেকে তাঁর নাম বাদ যাবে।

৭.৮. একজন রেজিস্টার্ড ডাক্তার ড্রাগস অ্যান্ড কসমেটিক্স অ্যাক্ট ও তার নানা ধারার-উপধারা মেনে চলতে বাধ্য। যথা—

(a) যেখানে নির্দিষ্ট চিকিৎসার প্রয়োজনে কাজে লাগবে না এমন ক্ষেত্রে স্টেরয়েড/সাইকোট্রপিক ড্রাগ ব্যবস্থাপত্রে দেওয়া।

(b) সিডিউল 'H' ও 'L'-এর অন্তর্ভুক্ত ড্রাগ ও বিষ শুধুমাত্র নিজের রোগী ছাড়া কাউকে দেওয়া।

উপরের বিষয়গুলো যদি ডাক্তার অমান্য করেন তবে সেটি তাঁর পেশার অপব্যবহার বলে ধরা হবে।

৭.৯. প্রশিক্ষণহীন কোনো ব্যক্তি যদি গর্ভপাত বা বেআইনি কোনো অপারেশন করেন (যার কোনো মেডিক্যাল সার্জিক্যাল ও মনস্তাত্ত্বিক কোনো কারণ নেই)।

৭.১০. অযোগ্য বা অ-চিকিৎসক কোনো ব্যক্তিকে আধুনিক চিকিৎসায় যোগ্যতা আছে এরকম কোনো সার্টিফিকেট একজন রেজিস্টার্ড ডাক্তার লিখে দিতে পারেন না।

[দ্রষ্টব্য: পূর্বের আইনিধারাটি ডাক্তারের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে রয়েছেন এমন যোগ্য ছাত্র-ছাত্রী, ধাত্রী, ওষুধ কর্মী, শল্য চিকিৎসা সহায়ক, দক্ষ যান্ত্রিক ও প্রযুক্তি সহায়ক এবং থেরাপি সহায়কদের জন্য প্রযোজ্য নয়]

৭.১১. একজন ডাক্তার অপেশাদার/সাধারণ কোনো সংবাদপত্রে কোনো অসুখ বা চিকিৎসা নিয়ে কোনো সাক্ষাৎকার বা লেখা দিতে পারবেন না যার প্রভাব হয়তো নিজের বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে বা তার প্র্যাকটিসের সমর্থন চাওয়া হবে। কিন্তু জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যসুরক্ষা নিয়ে তিনি নিজের নামে যেকোনো লেখাই ছাপাতে পারেন বা বক্তৃতা দিতে পারেন বা টিভি, রেডিও, নেটে নিজের বক্তব্য পেশ করতে পারেন এবং একই ঘোষণা তিনি সাধারণ সংবাদপত্রেও করতে পারেন।

৭.১২. একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে যদি কোনো সংস্থা চালানো হয়, যেমন—মেটারনিটি হোম, নার্সিংহোম, বেসরকারি হাসপাতাল, পুনর্বাসন কেন্দ্র বা যেকোনো রকমের প্রশিক্ষণ সংস্থা ইত্যাদি—তবে এদের বিজ্ঞাপন দেওয়াই যায়, তবে বিজ্ঞাপন যেন সেই সংস্থার নাম, যতরকম রোগী আসেন, যত ধরনের প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য সুবিধা এবং যা ফি নেওয়া হয় এসবকে ছাপিয়ে যেন না যায়।

৭.১৩. একটা অতিরিক্ত বড়ো সাইনবোর্ডে চিকিৎসকের নাম, তার শিক্ষাগত যোগ্যতা, সেই ইউনিভার্সিটি বা প্রতিষ্ঠানের নাম, তিনি যে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সেই বিষয়ের নাম, স্টেট মেডিক্যাল কাউন্সিল প্রদত্ত রেজিস্ট্রেশন নম্বর ইত্যাদি লেখাটা অশোভন। এগুলো সবই ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্রে থাকবে। এসবই কোনো সাইনবোর্ডে লিখে যেকোনো দোকানে ঝোলানো বা যেখানে তিনি থাকেন না বা কাজ করেন না সেখানে টাঙানোও অশোভন।

৭.১৪. একজন রেজিস্টার্ড ডাক্তার কখনোই রোগীর অসুস্থতা বা রোগী সম্বন্ধে গোপন কিছু, যা তিনি প্র্যাকটিস করতে করতে আয়ত্ত করেছেন, তা উন্মোচন করবেন না। এর ব্যতিক্রম করা যাবে—

(i) আদালতে বিচারকের আদেশে;

(ii) এমন একটা পরিস্থিতিতে যেখানে ওই ব্যক্তি বা ব্যক্তি গোষ্ঠীর গুরুতর বিপদের সম্ভাবনা আছে; এবং

(iii) নোটিফায়েবল রোগে—সংক্রামক/নোটিফায়েবল অসুখের ক্ষেত্রে, উপযুক্ত স্বাস্থ্য-কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে জানানো উচিত।

৭.১৫. রেজিস্টার্ড চিকিৎসক কেবলমাত্র ধর্মীয় কারণে কখনো কোনো নির্বীজকরণ প্রক্রিয়া, জন্ম-নিয়ন্ত্রণ, ছুন্নত এবং চিকিৎসাবিজ্ঞান পদ্ধতি অনুযায়ী গর্ভপাত করতে (যেখানে ডাক্তারি প্রয়োজন আছে) অস্বীকার করতে পারেন না যদি না তিনি নিজেকে পেশাগতভাবে অক্ষম বা অপারগ বলে মনে করেন।

৭.১৬. অপারেশন করার আগে চিকিৎসককে রোগীর স্বামী বা স্ত্রীকে দিয়ে সম্মতিপত্র লিখিয়ে নিতে হবে; নাবালকের ক্ষেত্রে তার বাবা-মা বা অভিভাবককে দিয়ে; বা প্রয়োজন পড়লে রোগী-নিজে লিখে দেবেন। যে অপারেশনে বন্ধ্যাত্ব হতে পারে, সেক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী; দু-জনেরই সম্মতি লাগবে।

৭.১৭. কোনো চিকিৎসা সংক্রান্ত পত্রিকায় বা অন্যান্য পত্রিকায় একজন রেজিস্টার্ড ডাক্তার তার রোগীর ফোটো বা কেস রিপোর্ট রোগীর অনুমতি ছাড়া প্রকাশ করতে পারবেন না, যা থেকে তাঁদের পরিচিতি জানা যায়। যদি পরিচয় উন্মোচিত না হয় তবে সম্মতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই।

৭.১৮. একটি নার্সিংহোম, যে ডাক্তার চালাবেন এবং তাঁকে সাহায্য করার জন্য সহায়ক নিযুক্ত করা হলেও এর চূড়ান্ত দায়িত্ব ডাক্তারের।

৭.১৯. দালাল বা এজেন্ট লাগিয়ে একজন ডাক্তার রোগী জোগাড় করবেন না।

৭.২০. একজন ডাক্তার কোনো বিশেষজ্ঞ হবার দাবি করতে পারেন না যতক্ষণ তিনি ওই বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সুলভ যোগ্যতা অর্জন করছেন।

৭.২১. স্ত্রী-রোগী ও তার স্বামী এবং শুক্রাণুদাতা—এদের কাছ থেকে জেনে বুঝে সম্মতি ছাড়া ইন-ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন বা আর্টিফিশিয়াল ইনসেমিনেশন করা যাবে না। সব রকম তথ্য—পদ্ধতি, ঝুঁকি, অসুবিধা, প্রক্রিয়া চলাকালীন কী কী ঝুঁকি বা বিপদের সম্ভাবনা থাকতে পারে ইত্যাদি জানিয়ে তবেই রোগীর সম্মতি পেতে হবে।

৭.২২. গবেষণা: ডাক্তারি ওষুধপত্রের পরীক্ষানিরীক্ষা বা অন্যান্য গবেষণার ক্ষেত্রে যেখানে রোগী ও স্বেচ্ছাসেবক জড়িত সেক্ষেত্রে আইসিএমআর (ICMR)-এর নির্দেশিকা মানতে হবে, নৈতিক বিচার্য বিষয়গুলো মাথায় রেখে। আইসিএমআর (ICMR)-এর নির্দেশিকা লঙ্ঘন

করলে সেটা অসদাচরণ। যদি ওষুধের বা চিকিৎসার পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য রোগীর নির্দেশিকা অনুসারে সম্মতি না নেওয়া হয় তাহলে সেটাও অসদাচরণ।

৭.২৩. কোনো চিকিৎসককে গ্রামে চাকরিতে পাঠানো হল, তিনি সেখানে থাকলেন না বা ডিস্ট্রিক্ট হেলথ অথরিটি-র প্রধান বা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পরিদর্শনে গেছেন, সেই সময় যদি চিকিৎসক দু-বারের বেশি অনুপস্থিত থাকেন তবে সেটি অসদাচরণ বলে ধরা হবে। যদি এটা মেডিক্যাল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া/রাজ্য সরকারের স্টেট মেডিক্যাল কাউন্সিলকে জানানো হয় তবে বিধি অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৭.২৪. ডাক্তারকে মেডিক্যাল কলেজ/ইনস্টিটিউশনে শিক্ষকতার জন্য বা অন্য কোনোভাবে পাঠানো হলে, তাদের নির্ধারিত সময় পর্যন্ত সেখানে উপস্থিত থাকতে হবে। যদি নির্ধারিত কাজের সময়ের দু-বারের বেশি অনুপস্থিত থাকেন তবে এটাও অসদাচরণ। প্রিন্সিপাল/মেডিক্যাল সুপারিনটেন্ডেন্ট যদি প্রত্যায়িত করে রাজ্য সরকারের মাধ্যমে মেডিক্যাল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া/স্টেট মেডিক্যাল কাউন্সিলকে জানান, তাহলে বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৮. শাস্তি ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

৮.১. এটা স্পষ্ট করে বুঝতে হবে—ওপরের তালিকাভুক্ত যেসব অপরাধ এবং পেশাগত অসদাচরণের কথা বলা হয়েছে, তার বাইরেও যদি একজন রেজিস্টার্ড চিকিৎসক কোনোরকম অপরাধ বা পেশাগত অসদাচরণ করেন সেগুলোও মেডিক্যাল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া বা স্টেট মেডিক্যাল কাউন্সিল বিবেচনার বাইরে রাখবেন না। সময়ে সময়ে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যেখানে তালিকার বাইরেও পেশাগত অসদাচরণের প্রশ্নটি আসতে পারে। সবদিক থেকেই আচরণ এমন করতে হবে যাতে আচরণবিধির আক্ষরিক এবং অন্তর্নিহিত সত্য কোথাও লঙ্ঘিত না হয়। এইসব ক্ষেত্রে মেডিক্যাল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া বা স্টেট মেডিক্যাল কাউন্সিল যেমন অন্য ক্ষেত্রগুলোতে বিবেচনা করেন তেমনভাবেই এসব ক্ষেত্রে প্রাপ্ত তথ্যগুলো বিচার করে সিদ্ধান্ত নেবেন।

৮.২. এটা স্পষ্ট যে, পেশাগত অসদাচরণের কোনো অভিযোগ উপযুক্ত শাস্তি বিধানের জন্য যথোপযুক্ত মেডিক্যাল কাউন্সিলের কাছে পেশ করা যাবে। মেডিক্যাল কাউন্সিল তখন একটি তদন্ত করবে এবং রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের শুনানি হবে, ডাক্তার নিজে (বা তাঁর উকিলের মাধ্যমে) উপস্থিত থাকবেন। যদি দেখা যায় অভিযুক্ত ডাক্তার দোষী তাহলে তার প্রয়োজনীয় শাস্তি বিধান করা যেতে পারে; অথবা তাঁরা অপরাধী ডাক্তারের নাম রেজিস্টার থেকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বা বরাবরের মতো বাতিল করে দিতে পারেন। রেজিস্টার থেকে ডাক্তারটির নাম বাতিল করা সমস্ত স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে ব্যাপক প্রচার করতে হবে এবং বিভিন্ন মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন বা সোসাইটি বা সংস্থার প্রকাশনায় প্রকাশ করতে হবে।

৮.৩. রেজিস্টার থেকে সাময়িক নাম বাতিল করার শাস্তি দেওয়া হলে যে নামটি রেজিস্টার থেকে বাতিল করা হয়েছিল, নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হলে কাউন্সিলের নির্দেশ অনুযায়ী নামটি আবার রেজিস্টারে পুনঃস্থাপন করা হবে।

৮.৪. দোষী চিকিৎসকের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে সেই সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত ৬ মাসের মধ্যে নিতে হবে।

৮.৫. অভিযোগের তদন্ত চলাকালীন যথোপযুক্ত কাউন্সিল যে বিষয়ে তদন্ত চলছে সেই বিষয়ের কোনো প্রক্রিয়া বা প্র্যাকটিস করা থেকে সেই চিকিৎসককে তখনকার মতো বিরত করতে পারে।

৮.৬. মেডিক্যাল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার নির্দেশিকা মেনে চিকিৎসকের পেশাদারি অযোগ্যতা তাঁর সহকর্মীদের থেকে জানা হবে।

খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে

চিকিৎসক অসদাচরণ করলে মেডিক্যাল কাউন্সিল তার বিচার করবে। চিকিৎসকের সদাচরণ বলতে যা যা বোঝার তার একটা সাধারণ তালিকা নিম্নরূপ।

- দেশের আইন লঙ্ঘন না করা।
- রোগীর নথি যথাবিহিত রক্ষণাবেক্ষণ করা ও রোগী তা চাইলে সেটি দেওয়া।
- রোগীর সঙ্গে ব্যভিচার বা অশোভন আচরণ না করা।
- অবৈধভাবে লিঙ্গ-নির্ধারণ পরীক্ষা বা কন্যাভ্রূণহত্যা করায় অংশগ্রহণ।
- যথাযথ সার্টিফিকেট সুনির্দিষ্ট কারণ দেওয়া ও ভুল সার্টিফিকেট না দেওয়া।
- ড্রাগ ও কসমেটিক্স অ্যাক্ট-এর ধারা অনুসারে ওষুধ লেখা; বিশেষ করে ডাক্তারি প্রয়োজন ব্যতীত স্টেরয়েড, মানসিক ওষুধ, ‘এইচ’ ও ‘এল’ তালিকাভুক্ত ওষুধগুলো ব্যবস্থাপত্রে না লেখা।
- প্রশিক্ষণহীন ব্যক্তি কর্তৃক কোনো অপারেশন, বিশেষত গর্ভপাত, এসবে সাহায্য না করা।
- অযোগ্য ব্যক্তিকে চিকিৎসা সংক্রান্ত কোনো ব্যাপারে পারদর্শিতার সার্টিফিকেট না দেওয়া।
- নার্সিংহোম ইত্যাদি চালানোর জন্য সহায়তাকারী নিয়োগ করলে, রোগীর চূড়ান্ত দায়িত্ব চিকিৎসকেরই।
- নিজের বিজ্ঞাপন করার উদ্দেশ্যে দালাল লাগিয়ে রোগী জোটানো, বা সাধারণের জন্য প্রকাশিত সংবাদপত্র, রেডিও, টিভি ইত্যাদিতে লেখা বা সাক্ষাৎকার প্রকাশ করা অনুচিত। অন্যপক্ষে, জনগণের হিতের জন্য নানা মিডিয়ায় ঠিক খবর স্ব-নামে পৌঁছে দিতে সব রকম চেষ্টা করা উচিত।
- বেসরকারি হাসপাতাল, নার্সিংহোম ইত্যাদির বিজ্ঞাপন করা যেতে পারে, কিন্তু সেখানে কেবলমাত্র সেই সংস্থায় প্রাপনীয় সুনির্দিষ্ট পরিষেবা ও তার ফি ছাড়া অন্য বিষয়ে, বা ভ্রান্তি-উদ্রেককারী, কোনো বক্তব্য থাকবে না।
- চিকিৎসকের ডিগ্রি, বিশেষ পারদর্শিতা, রেজিস্ট্রেশন নম্বর তাঁর ব্যবস্থাপত্রে লিখতে হবে, কিন্তু সেটা নিয়ে বেমানান রকমের বড়ো, বা যেখানে ডাক্তার বসেন না সেখানে সাইনবোর্ড টাঙানো—এসব ঠিক নয়। যে বিষয়ে বিশেষ যোগ্যতা অর্জন করেননি, সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হবার দাবি করা বেঠিক।
- রোগীর গোপন তথ্য কখনোই চিকিৎসক অন্যের কাছে ফাঁস করবেন

না, যদি না তিনি আদালত দ্বারা সেটা বলতে আদেশ পান, বা রোগের কথা প্রকাশ না করলে রোগী বা অন্য কারও বিপদ হতে পারে, বা রোগটি সরকার-কর্তৃক ‘নোটিফায়েবল’ বলে চিহ্নিত হয়ে থাকে।

- জন্ম-নিয়ন্ত্রণ, গর্ভপাত ইত্যাদি করতে ধর্মীয় কারণে অস্বীকার করা চিকিৎসকের অনুচিত কাজ।
- অপারেশন করার আগে চিকিৎসককে রোগীকে দিয়ে, বা তার স্বামী, স্ত্রী, বা নাবালকের ক্ষেত্রে বাবা বা মাকে দিয়ে সম্মতিপত্র লিখিয়ে নিতে হবে। বন্ধ্যাত্ব হতে পারে এমন অপারেশন করার আগে স্বামী-স্ত্রী দু-জনেরই সম্মতিপত্রে স্বাক্ষর দেরকার।
- যেমন ফোটোতে রোগীকে চেনা যায়, তেমন ফোটো চিকিৎসক তাঁর কেস রিপোর্ট ইত্যাদিতে প্রকাশ করতে গেলে রোগীর সম্মতি আবশ্যক।
- ইন-ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন বা স্বামী-ব্যতীত অন্য শুক্রাণুদাতার শুক্রাণুর সাহায্যে সন্তান জন্মের কাজে হাত দেবার আগে স্বামী-স্ত্রী-শুক্রাণুদাতাকে বিষয়টির নানা দিক, ঝুঁকি, অসাফল্যের সম্ভাবনা সবই বুঝিয়ে বলতে হবে ও যথাযথ গোপনীয়তা বজায় রাখতে হবে।
- ওষুধ বা চিকিৎসাপদ্ধতির পরীক্ষা ইত্যাদি গবেষণার ক্ষেত্রে, যেখানে রোগী ও স্বেচ্ছাসেবক জড়িত থাকেন, সেখানে আইসিএমআর-এর নির্দেশিকা মানতে হবে।
- গ্রামে সরকারি চাকরিতে নিযুক্ত চিকিৎসক যদি সেখানে না থাকেন, বা যথাযথ কর্তৃপক্ষের পরিদর্শনের সময় যদি তিনি পরপর দু-বার অনুপস্থিত থাকেন, তবে কর্তৃপক্ষ সেই ঘটনাটি মেডিক্যাল কাউন্সিলে জানালে সেটা চিকিৎসকের অসদাচরণ বলে গণ্য হবে। মেডিক্যাল কলেজে নিযুক্ত চিকিৎসকের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য।
- ওপরে উল্লিখিত বিষয় ছাড়াও, অন্য কোনো সাধারণ অসদাচরণ করলে, সেগুলোও মেডিক্যাল কাউন্সিল বিচার করতে পারে। পেশাগত অসদাচরণের যেকোনো অভিযোগ মেডিক্যাল কাউন্সিলের কাছে পেশ করা যাবে। চিকিৎসক বা তাঁর প্রতিনিধির উপস্থিতিতে শুনানির পর শাস্তি হতে পারে। যেমন চিকিৎসকদের আইনি তালিকা থেকে তাঁর নাম সাময়িকভাবে বা বরাবরের জন্য বাদ যেতে পারে, এবং এই বাদ যাবার ঘটনাটি বিজ্ঞাপিত করা হবে। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

অনুবাদ করেছেন দুনিয়া গঙ্গোপাধ্যায়

শব্দ-ছক-৩ সমাধান

			১ ক্লো	২ ভা			৩ মা	৪ ই	গ্রে	৫ ন	
	৬ পা	য়ো	রি	য়া		৭ সা	ই	কো		৮ র	ক্ত
	স্তু		৯ ন	ল			ক্রো			ফ্লু	
১০ স্কা	র	১১ ভি			১২ এ	ন্ডো	স্কো	১৩ পি		ক্স	
		১৪ সে	১৫ বা		ড		১৬ প	টি		১৭ টি	বি
	১৮ সো	রা	ই	১৯ সি	স					জে	
			২০ পা	স্ট		২১ ফা	২২ ই	ব্র	য়ে	ড	
২৩ কো	লা	২৪ প	স		২৫ ব্রা		স্কি				২৬ ডা
রা		লি		২৭ লি	উ	কে	মি	য়া		২৮ ল্যা	ব
মি		প		২৯ পি	ন		য়া			ন্সে	
৩০ ন	স্যি		৩১ লে	ড				৩২ রি	কে	ট	
		৩৩ কা	বু				৩৪ ফ্লা	স্ক			

জঙ্গলমহলে অলৌকিক ফুঁ, রোগ সারার গুজব ও বিজ্ঞানের জয়

বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত গ্রামে অলৌকিকভাবে রোগ সারানোর আশায় ভিড় করে হাজার-হাজার মানুষ। 'ড্রাগ এন্ড ম্যাজিক রেমিডিস অ্যাক্ট' অনুযায়ী সেখানে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ায় বহু মানুষ বেঁচে গেলেন। কিন্তু এ দেশের সর্বোচ্চ স্তরে চলছে এখন স্বাস্থ্যের নামে অপবিজ্ঞানের দর্পিত পদচারণা। দিনলিপি লিখেছেন **সৌম্য সেনগুপ্ত।**

চিত্র: ১. গ্রামে ভিড়

শুরুর দিন: ১১.১২.২০১৫—রাত্রিবেলা বন্ধু গণপতির কাছে প্রথম পেলাম খবরটা। কাশিচটা গ্রামের এক কিশোরী ঘটাচ্ছে অলৌকিক কাণ্ড। ফুঁ-মাদুলি আর কলমের দাগে সারছে সমস্ত রোগ। হাজার-হাজার মানুষ ভিড় জমাচ্ছেন সুস্থ হবার আশায়। যে ''অলৌকিক ঘটনা'' বিশ্বাস করে মানুষের এই ছুটে যাওয়া তা এই রকম—বহু জন্ম-বোবার নাকি ফুঁ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বোল ফুটেছে। সবচেয়ে ক্লাসিক গুজবটি হল—এক পুলিশ অফিসার খবর পেয়ে এই সব অলৌকিক উপায়ে রোগ সারানোর বেআইনি কাজ আটকাতে গেলে মেয়েটি নাকি গান্ধিগিরি করে তাকে আটকে দেয়—অফিসারেরই জন্ম-বোবা মেয়ের মুখে বোল ফুটিয়ে দেয়, আর সেই মেয়ের কথাতে অফিসার বোঝেন তিনি কী ভুল করতে যাচ্ছিলেন।

১২.১২.২০১৫—মোটরবাইকে বেড়িয়ে পড়লাম আমার স্কুলে প্রধান শিক্ষক দিলীপ কুম্ভকার, সাহেব দে ও আমি। নানাজনকে বারে বারে পথ জিজ্ঞেস করে শালজঙ্গলের পথ পেরিয়ে বিষ্ণুপুর ব্লকের জিয়াবান্ধি পোস্ট অফিসের অন্তর্গত কাশিচটা গ্রামে আমাদের গন্তব্যের এক কিলোমিটার আগে থেকেই বুঝতে পারছিলাম জনসমাগম সম্পর্কে যা শুনে এসেছি তা পুরো মিথ্যা নয়।

ঘটনাস্থল থেকে প্রায় ১০০ মিটার দূরে মোটরসাইকেল দাঁড় করাতেই কানে আসতে থাকল মাইকের ঘোষণা ''দয়া করে আপনারা কেউ ওকে টাচ করবেন না, তাতে আপনাদেরই টাইম নষ্ট'' . . . ''মধু সকালে দু-চামচ রাত্রে দু-চামচ . . .।'' প্রায় খান-পঞ্চাশেক বড়ো গাড়ি, অগুন্তি সাইকেল ও মোটরসাইকেল পেরিয়ে ঘটনাস্থল গ্রামের দক্ষিণপ্রান্তের বড়ো ফুটবল মাঠে রীতিমতো মেলা বসে গেছে। কাছে যেতেই দেখি রাস্তার দু-পাশে সার দিয়ে বিক্রি হচ্ছে তেল-পানি। আধ লিটারের মিনারেল ওয়াটারের বোতল ও একটি ছোটো তেলের শিশি, দাম ২০ টাকা।

আরও কাছে যেতে দেখি সারা মাঠে নানান পেশার ও নানান স্তরের মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত-দরিদ্র, পুরুষ-মহিলা-শিশু-কিশোর-কিশোরী সবাই হাতে জল আর তেলের নতুন শিশি নিয়ে পাশাপাশি লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন বগদহরা হাই মাদ্রাসার সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী রূপা ভাঙ্গির ''আলৌকিক ফুঁ''-এর অপেক্ষায়। পুরুষ ও মহিলার আলাদা আলাদা লাইন। বাঁশের খুঁটি পুঁতে মাঠের চারপাশে সরু তার দিয়ে ব্যারিকেড বানানো রয়েছে। সকলে, মাঠের উত্তর দিকে ত্রিপল দিয়ে বানানো, অস্থায়ী অফিস কাম ঘোষণা কাম 'অপারেশন থিয়েটার' কাম অলৌকিক কিশোরীর বিশ্রাম ঘর— সে দিকে উৎসুক হয়ে তাকিয়ে সবাই অপেক্ষা করছেন কখন ''পীর ঠাকুরে'' ভর করা 'দেবী'র আবার জ্ঞান ফিরবে। জ্ঞান হারানোর ব্যাপারটা বোঝা গেল অফিসের ঘোষণায়—''ভিডিও ক্যামেরা চালাবে না, ওনাকে টাচ করবে না। ভিডিও ক্যামেরা চালালে বা ওনাকে টাচ করলে তোমাদেরই ক্ষতি। তোমাদেরই টাইম নষ্ট হবে।'' জানা গেল ফুঁ দিতে দিতে কেউ ছুঁয়ে দিলেই কিশোরী আধ ঘণ্টার জন্য জ্ঞান হারাচ্ছে।

সব মিলে এই লালমাটির বাঁকুড়ার জঙ্গলমহলের এই অখ্যাত গ্রাম কাশিচটায় অগ্রহায়ণের পড়ন্ত বেলায় ওই মাঠে হাজার দুয়েক মানুষ হাজির। সারা দিনে সংখ্যাটা যে ১০ হাজার ছাড়াচ্ছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। গ্রামের নাম এখন দিকে দিকে। নানা রোগী, স্থানীয় ''স্বেচ্ছাসেবক'' ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বললাম। গুণকীর্তনকারীদের কাছে উপকৃত ''বোল-ফোটা বোবা''-র ঠিকানা জানতে চাইলে তাঁদের উত্তর, ব্যাপারটা তাঁরাও শুনেছেন, চেনেন না এমন কাউকেই। রোগী সেজে বেশ কিছুক্ষণ থেকে সবকিছু গোপন ক্যামেরায় রেকর্ড করে মনে এক রাশ উদ্বেগ-দুঃখ-কৌতুক-রাগ-আতঙ্ক মেশানো এক অবর্ণনীয় অনুভূতি নিয়ে ফিরে এলাম। আসার সময় কানে বাজতে থাকল স্থানীয় এক যুবকের চাপা গলায় টেলিফোনে কাউকে বলা কথা, ''সত্যি মানুষ এখনও এত বোকা আছে?'' কিংবা এক চাষীর আক্ষেপ, ''এত মানুষের মল-মূত্র-আলু চাষ এবার লাটে উঠল!''

১৪.১২.২০১৫—সমস্ত ঘটনা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করে আমাদের তদন্তে যা যা উঠে এসেছে তার রিপোর্টসহ ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির রাধানগর শাখার পক্ষ থেকে পুরো বিষয়টা জানিয়ে নিম্নলিখিত ধারায় অভিযোগ জানাতে গেলাম বিষ্ণুপুর থানায় ইন্সপেক্টর-ইন-চার্জ (আইসি)-র কাছে। কপি পাঠানো হল জেলাশাসক, এসডিও এবং বিডিও-কে।

১. ড্রাগ অ্যান্ড ম্যাজিক রেমিডিস (অবজেকশনেবল অ্যাডভার্টাইজমেন্ট) অ্যাক্ট ১৯৫৪ অনুযায়ী মন্ত্রতন্ত্র তাবিজ কবজ মাদুলি এই সব দিয়ে অলৌকিক উপায়ে রোগ সারানো বা রোগ সারানোর দাবি করাই বেআইনি।

২. ড্রাগস অ্যান্ড কসমেটিক আইনে সুনির্দিষ্ট পরীক্ষামালার মধ্যে দিয়ে যাওয়া কোন কোন বস্তুকে ‘‘ওষুধ’’ বলা হবে যা দিয়ে রোগ সারানো যায় তার সুনির্দিষ্ট উল্লেখ আছে। ফুঁ দেওয়া মন্ত্রপুত জল-তেল-মাদুলি কখনো ওষুধ হতে পারে না।

৩. ইন্ডিয়ান পেনাল কোড (আইপিসি)-এর ৪২০ ধারা অনুযায়ী মানুষকে প্রতারণা করে পয়সা নেওয়া বেআইনি। এখানে মানুষকে জল ও তেল কিনতে বাধ্য করা হচ্ছে।

৪. আইপিসি-র ১২০/বি ধারা অনুযায়ী অনেকে মিলে আয়োজন করে সংগঠিত প্রতারণা হল ক্রিমিনাল কন্সপিরেসি। এখানে অনেকে মিলে অপরাধ সংঘটিত করা হচ্ছে।

আমাদের সঙ্গে ছিলেন স্থানীয় সাংবাদিকেরা। তাঁদের সকলকে সংগঠনের তরফে প্রেস রিলিজ দেওয়া হয়, সঙ্গে অভিযোগের প্রতিলিপি। সেই দিনই বিকেলে *আনন্দবাজার*-এর ফোটোগ্রাফার শুভ্র মিত্র ছবি তুলতে গেলে কয়েক হাজার মানুষ তাঁকে ঘিরে ধরেন ও কোনোমতে জীবন নিয়ে তিনি ওখান থেকে ফিরে আসতে সক্ষম হন।

১৫.১২.২০১৫—*আনন্দবাজার*, *বর্তমান*, *সংবাদ*, ই-টিভির নিউজ পোর্টাল গুরুত্ব সহকারে খবরটি ছাপে। ওই দিনই বেলা ১২টা নাগাদ বিরাট পুলিশ ও র‍্যাফ নিয়ে বিডিও স্বয়ং যখন ঘটনাস্থলে পৌঁছোন তখন সেখানে প্রায় ৩০ হাজার মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন অলৌকিক ফুঁ-এর অপেক্ষায়। অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে ঝুঁকি নিয়ে বিডিও জয়তী চক্রবর্তী মেয়েটি (রূপা ভাঙ্গি) ও তার বাড়ির লোকের সঙ্গে কথা বলে কড়া পদক্ষেপ নেন; বন্ধ করে দেন প্রায় সাড়ে তিন মাস ধরে চলা বুজরুকি। সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুপুরের বিডিও-কে সমিতির পক্ষ থেকে এমন সাহসী পদক্ষেপকে অভিবাদন জানানো হয় এবং এইসব ফাঁদকে চেনার কাজে মানুষকে সচেতন করার কাজে সার্বিক সহযোগিতা করার কথা জানাতে তিনি তার প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেন।

১৬.১২.২০১৩----*সংবাদ*, *আনন্দবাজার*, *বর্তমান*, *প্রতিদিন* গুরুত্বসহকারে এই ব্যাপারটা নিয়ে খবর করে।

কাজ কি হচ্ছে না? তাহলে মানুষ যাচ্ছে কেন?

মানুষের মন ও শরীরের নিয়ম অনুযায়ী, এরকম ক্ষেত্রে কিছু মানুষের মনে নিশ্চিত ধারণা হবে যে তিনি ভালো হলেন। একে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় ‘‘প্ল্যাসিবো-এফেক্ট’’ বলে। একইভাবে, বিভিন্ন ব্যথায় মালিশের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ (মেলজ্যাক ও ওয়াল-এর নোবেলজয়ী তত্ত্ব অনুযায়ী-১৯৬৫)। আবার চিকিৎসাবিজ্ঞানের নিয়ম অনুযায়ী প্রাপ্তবয়স্কদের

চিত্র: ২. মন্ত্র ওষুধ পাবার লাইন

৩০% ও ছোটোদের ৭০% রোগ নিজে থেকে সারে (যেমন ভাইরাল জ্বর, বেশ কিছু ভাইরাল পেটের অসুখ ইত্যাদি)। তাই কিছু মানুষের নিশ্চিত ‘‘মনে হবে’’ তিনি তেল-পানি নিয়েই সুস্থ হলেন।

কিন্তু এর বিপদ কম নয়। হয়তো কোনো ব্লাড প্রেশারের রোগী তুকতাকে সেরে যাবার বিশ্বাসে ভর করে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের ওষুধ বন্ধ করে, হঠাৎ রক্তচাপ বেড়ে গিয়ে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণে প্যারালাইজড হয়ে যেতে পারেন। বিপদে পড়বেন হাঁপানি বা সুগারসহ ‘‘শিডিউল-জে’’ তালিকাভুক্ত (৫১টি রোগ যা ওষুধ দিয়ে বরাবরের মতো সারিয়ে দেবার দাবিই অপরাধ) অসুখে ভোগা রোগী যারা প্ল্যাসিবো ক্রিয়ায় ভালো থাকবেন, কিন্তু ভালো হবেন না, ক্রমশ তলিয়ে যাবেন। নানা রোগে ভোগা বহু মানুষই যারা ‘‘প্ল্যাসিবো-এফেক্ট’’-এর সাময়িক উপশমে সন্তুষ্ট হয়ে প্রয়োজনীয় ওষুধ বন্ধ করে মারাত্মক বিপদে পড়বেন। বিপদে পড়বেন সেইসব মানুষ যাদের তাৎক্ষণিক জরুরি চিকিৎসা দরকার—যেমন সাপে-কাটা রোগী। এবং তাঁদের বিপদের কথা এমনকী মৃত্যুর কথা আমরা কেউই জানতে পারব না।

খবরের পরের খবর—এসব এখনও টিকে আছে কেন? এটাই লাখ টাকার প্রশ্ন—ওই মানুষগুলোকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলে গালি দেওয়ার আগে আমাদের জেনে রাখা দরকার—মাদার টেরিজার ‘‘অলৌকিক ক্ষমতায় পোপের সিলমোহর’’-এর মতো ‘‘বিশ্ব-বন্দিত-কুসংস্কার’’ যতদিন না বন্ধ হবে, সরকারি মদতে প্রতিটি টিভি চ্যানেলে ‘‘ধনলক্ষ্মী যন্ত্র’, ‘‘আল্লাহ্ লকেট’’, ‘‘শনি রক্ষা কবচের’’ কিংবা হীরক রাজার দেশের পণ্ডিতমশাই দ্বারা বিজ্ঞাপিত ‘‘হনুমান চল্লিশা’’ যতদিন না বন্ধ হবে, সমস্ত মানুষ যতদিন না বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে উঠবে, সর্বোপরি যতদিন সবার স্বাস্থ্যের দায়িত্ব সরকার সত্যি সত্যি না নেবে, ততদিন গলিতে গলিতে কাশিচটার ‘‘অলৌকিক ফুঁ’’-এর মতো হাজার হাজার প্রতারণার ফাঁদে পড়ে মানুষের ধনেপ্রাণে মৃত্যু চলতেই থাকবে!

আর সঙ্গে চলবে এসবের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ! আপনার অংশগ্রহণ ছাড়া সে কাজ অসম্ভব। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

সৌম্য সেনগুপ্ত, শিক্ষক ও বিজ্ঞানকর্মী।

বিশ্বাস ও মৌলবাদ: কিছু তত্ত্ব ও মতামত

‘Man is what he believes’ [Anton Chekhov] চেকভ যথার্থই বলেছেন একজন মানুষের আচরণ, সচরাচর সে কী বিশ্বাস করে তার দ্বারা অনেকাংশেই নিয়ন্ত্রিত হয়। বিশ্বাস যেন মস্তিষ্কের নিরুচ্চার নির্দেশ যা আমাদের মন ও মননকে সদাই অনুগত সৈনিকের মতো শুধু ঊর্ধ্বতনের ইচ্ছাকে ফলপ্রসু করে তোলার যন্ত্র বানিয়ে রাখে—দ্বিধাহীন, কৌতূহলহীন আর প্রশ্নহীন। মানব এবং মানবগোষ্ঠীর (group) আচরণের ক্ষেত্রে এত বড়ো ভূমিকা পালন করছে যে বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসকে নিয়েই এবারের প্রবন্ধ। বিশ্বাস কীভাবে গড়ে ওঠে, কীভাবে একের বিশ্বাস অন্যতে সঞ্চারিত হয়, ধর্মীয় মৌলবাদে বিশ্বাসের ভূমিকা কী—এসব নিয়েই লিখেছেন **রুমঝুম ভট্টাচার্য।**

বিশ্বাস কী? আচরণের চালিকাশক্তি হিসাবে তার ভূমিকা কতটা?

“A belief defines an idea or principle which we judge to be true” [Psychology Today]—অর্থাৎ একটা ধারণা বা সূত্র যেটা আমাদের সত্য বলে মনে হয় তাই বিশ্বাস। বিশ্বাস গড়ে ওঠার উৎস বিভিন্ন—সামাজিক পরিবেশ, অভিজ্ঞতা, শিক্ষা, সংস্কৃতি-ধর্ম ইত্যাদি ইত্যাদি। ব্যক্তির বিশ্বাস যেহেতু নিজস্ব, তার সঙ্গে বাস্তব সত্যের যোগ থাকতেও পারে আবার নাও পারে। একজন ব্যক্তির এক-শোটা বিশ্বাসের মধ্যে হয়তো কুড়িটা বিশ্বাসের বাস্তব ভিত্তি নেই। ঠিক সেরকম জ্ঞান (knowledge) থেকে গড়ে ওঠা বিশ্বাস ছাড়াও ব্যক্তির নিজস্ব ধারণাসংক্রান্ত বিশ্বাসও কাজ করতে পারে। শিশু ছোটোবেলায় মায়ের কাছে জানতে পারে আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যায়। বেশিরভাগ শিশুই মায়ের কথা বিশ্বাস করতে আরম্ভ করে ও সে আগুনে হাত দেওয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখে। এ ক্ষেত্রে তার আচরণের চালিকাশক্তি হল বিশ্বাস। এটা একটা অতিসরল উদাহরণ যার থেকে বোঝা যেতে পারে ব্যক্তির বিশ্বাস কেমনভাবে গড়ে ওঠে ও সেই বিশ্বাস তার আচরণকে কীভাবে প্রভাবিত করে। কিন্তু কার্যত ব্যক্তির ধারণা (concept) ও বিশ্বাসের (belief) জগৎটা মোটেও এত সরল সাদাসিধা নয়। শিশু যতই বড়ো হতে থাকে, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, সমাজ ও সংস্কৃতি, থেকে বিভিন্ন ধরনের ধারণা (concept) বিশ্বাস (belief) তার মধ্যে দানা বাঁধতে থাকে যা পক্ষান্তরে তার আচরণকে (behavior) অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করে। আর এই বিশ্বাসগুলির মধ্যে যোগসূত্রও তৈরি হতে পারে যা কিনা একটা সম্পূর্ণ সিস্টেমে পরিণত হয়। সাইকোলজি ডিক্শনারি অনুযায়ী—‘Belief system is a set of beliefs which guide and govern a person's attitude.’ ব্যক্তির মনোভাব (attitude) কীসের প্রতি?—যেমন ধর্মের প্রতি, কোনো আদর্শের প্রতি, জীবনদর্শনের প্রতি।

অর্থাৎ এ যাবৎ আলোচনার থেকে বলা যায়, ব্যক্তির বিশ্বাস বিভিন্ন উৎস (জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, সমাজ, ধর্ম) থেকে আগত গাইডলাইনস্ এবং তার নিজস্ব ধারণা মিলেমিশে গড়ে ওঠে যা কিনা পরবর্তীকালে নিজেদের মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে পেলে সমষ্টিগতভাবে একটা সিস্টেম হিসাবে ব্যক্তির আচরণকে প্রভাবিত করে। শুধু আচরণ নয় তার মনোভাব (attitude) ও জীবনদর্শন (Philosophy) নির্ধারিত হয় এই বিশ্বাসগুলির ওপর ভিত্তি করে।

বিশ্বাস কি তবে ভাইরাসের মতো, ছোঁয়াচে?

খ্যাতনামা জীববিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্স প্রথম নজর করলেন যে বিশ্বাসের পুনরাবৃত্তি অনেকটা জিনের পুনরাবৃত্তির মতোই। ব্যাপারটা একটু বিশদে বলা যাক। জীববিজ্ঞানের মতে জিন হল বংশগতির ক্ষুদ্রতম একক। জিনের মধ্যে তথ্য সংরক্ষিত থাকে। জিন থাকে DNA-এর নির্দিষ্ট স্থানে। রাসায়নিক নির্দেশ পেলে জিনের পুনরাবৃত্তি ঘটে যার ফলে ব্যক্তির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বংশগতভাবে নির্দিষ্ট হয় যেমন—গায়ের রং কালো হবে না সাদা হবে, মাথায় চুল কোঁকড়া হবে না টাক হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। ডকিন্স বিশ্লেষণ করে দেখান যে, বিশ্বাসের পুনরাবৃত্তি অনেকটা জিনের পুনরাবৃত্তির মতোই। যাকে তিনি mnemonic gene বা ‘memi’ বলেছেন। তার এই তত্ত্বের ভিত্তি হল চালর্স ডারউইনের বিবর্তনবাদ।

যদিও ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে বংশগতিই একমাত্র নির্ধারক হিসাবে কাজ করে না। পরিবেশের (environment) ভূমিকাও এ ক্ষেত্রে অনস্বীকার্য। বংশগতি ও পরিবেশের পারস্পরিক ক্রিয়ায় (interaction) ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য, নির্ধারিত হয়। আসলে রিচার্ড ডকিন্স মহাশয়ের ‘memi’ তত্ত্ব রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি জিন তত্ত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই তত্ত্ব দেন।

জিন নিয়ে কাজ করতে গিয়ে তিনি অনুধাবন করলেন যে জিনের মধ্যে যেমন তথ্যের রূপান্তর ও পুনরাবৃত্তি ঘটে ঠিক সেরকমটি লক্ষ করা যায়

মানব সমাজের ক্ষেত্রেও। জিন যেমন নিজের কপি তৈরির সময় খুব অল্প অল্প করে রূপান্তরিত হতে থাকে যাতে কিনা বর্তমানে বিরাট কোনো পরিবর্তন চোখে পড়ে না, কিন্তু হাজার বছর পরে হয়তো একটা নতুন জীবজাতির (species) অস্তিত্ব তৈরি হয়। এইভাবেই এককোষী জীব বিবর্তিত হয়ে আজকের মানবজাতি সৃষ্টি হয়েছে। দৈহিক এই রূপান্তরের মতোই মননের রূপান্তর ঘটে চলেছে নিরন্তর যার ফলে ঘটছে সংস্কৃতির বিবর্তন। ডারউইনের মতে জীবজগতের বিবর্তনের মূল চালিকাশক্তি হল প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural selection) [Darwin, Charles, *Origin of Species*, 1859]। অর্থাৎ টিকে থাকার লড়াইয়ে যে প্রজাতি (species) জয়ী হবে তারাই রূপান্তরের মাধ্যমে এগিয়ে যাবে। ডকিন্স ও অন্যান্য গবেষকদের মতে মানবসংস্কৃতির বিবর্তনও ঘটে অনেকটা এরকমভাবেই। অনেক ধ্যানধারণা, বিশ্বাস জন্মায়। তাদের নিজের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাতে কিছু ধ্যান-ধারণা লুপ্ত হয়ে গেছে। কারণ প্রতিযোগিতায় তারা টিকতে পারেনি। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় মধ্যযুগে যেসব বর্বর কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস বা ধ্যানধারণা প্রভাব বিস্তার করেছিল বিজ্ঞানের উন্মেষ ও নবজাগরণের ফলে তার অনেকগুলোই আজ লুপ্ত। তবে কি ধ্যানধারণা বা বিশ্বাস বংশবিস্তার করে। আজ্ঞে হ্যাঁ। বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী ম্যাট রিডলী বলেইছেন—“at some point in human history, ideas began to meet and mate, to have sex with each other.’।

এই আলোচনার থেকে উঠে আসে পরবর্তী প্রশ্ন—কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও অবৈজ্ঞানিক বিশ্বাস যা কিনা সুশীল সমাজগঠনের পরিপন্থী এবং মানবতাবাদের বিরোধী তেমন বিশ্বাসগুলিও কি তবে ভাইরাসের মতো ছড়িয়ে পড়ে মানবসমাজে? মৌলবাদ আজকের মানবসভ্যতার সবথেকে বড়ো অসুখ। সেই মৌলবাদের স্তম্ভ হল বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাস। এই ধর্মীয় বিশ্বাসগুলির উৎস প্রধানত বিভিন্ন ধর্মে প্রদত্ত নির্দেশাবলি। যুগে যুগে পৃথিবীর ইতিহাসে বিভিন্ন ধর্ম তাদের নিজস্ব জীবনদর্শন নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। মানবজীবনে তাদের ভূমিকা এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়, এমনকী সেই ধর্মগুলির কাণ্ডারী যে ঈশ্বর (God) তিনিও আস্তিকের কাছে ‘অস্তি’ আর নাস্তিকের কাছে ‘নাস্তি’ বই তো আর কিছু নন। কিন্তু সেই ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে গড়ে তোলা মানুষের নিজস্ব বিশ্বাসের ভিত্তিতে মৌলবাদের নামে যে হত্যালীলা যুগ যুগ ধরে চালানো হয়েছে (অসংখ্য ধর্মযুদ্ধ যার প্রমাণ) তার স্বরূপ ও প্রতিকার অবশ্যই আলোচনাযোগ্য। একথা অনস্বীকার্য ধর্মে বিশ্বাসী মানুষের সংখ্যা সাধারণভাবেই অনেক বেশি। কিন্তু বেশি মানুষ বিশ্বাস করছে বলেই বিশ্বাসগুলি স্বতঃসিদ্ধ এমন মনে করা আসলে বাতুলতা। মানবসভ্যতার বিকাশ, বিজ্ঞানের চর্চা আসলে মানবতারই জয়। আগামীদিনে অবৈজ্ঞানিক, অযৌক্তিক, কুসংস্কারাচ্ছন্ন

বিশ্বাসগুলি ভাইরাসের মতো ছড়াতে থাকলে বিবর্তনের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার গতি হবে শ্লথ। তাই উন্নত মানবজাতি গঠনের স্বার্থে, তথাকথিত ধার্মিক মৌলবাদীদের সংকীর্ণ জীবনদর্শন কখনোই সমর্থনযোগ্য নয়। মৃত্যুর পরে মূর্খের স্বর্গ রচনা করার স্বপ্ন না দেখে যুক্তিসম্মত বৈজ্ঞানিক জীবনদর্শন গড়ে তোলা প্রয়োজন।

মৌলবাদী কারা? আমার আপনার মতোই তো তারাও মানুষ। কিন্তু তাদের বিশ্বাসের জায়গাগুলো আচ্ছন্ন করে রেখেছে ধর্মীয় নির্দেশাবলি ও ধর্মগুরুর উপদেশ। এও এক ধরনের মাদক নেশার মতো নেশা যা মানুষের যুক্তিবোধকে আচ্ছন্ন করে। তাই শিশুকে দিন সুস্থ চিন্তা করার—ভালো-মন্দ চিন্তা করার বোধ। অযথা বিশ্বাসের বোঝা তার ওপর না চাপিয়ে দেওয়াই ভালো। এতে তার ব্যক্তিত্ব হবে সবল ও বলিষ্ঠ। ভবিষ্যতে কোনো প্রতিষ্ঠানের নির্দেশ মেনে চলার আগে সে বুঝে নেবে তা মানবজাতির কল্যাণ সাধিত করে নাকি পৃথিবীর বুকে গড়ে তোলে নরক, মৃত্যুর পর স্বর্গের সুখ পাবে বলে। সবশেষে, কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কয়েকটি লাইন—

তবু যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি—
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।
অবশেষে সব কাজ সেরে
আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে
করে যাব আশীর্বাদ,
তারপর হব ইতিহাস।।

লেখক: মনোবিদ ও প্রাবন্ধিক।

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

মাত্রাছাড়া রক্তচাপ

রক্তচাপ বলতে কী বোঝায়? সিস্টোলিক-ডায়াস্টোলিক দু-রকম রক্তচাপ থাকার কারণ কী? রক্তচাপ বেশি বাড়লে বা কমলে কী কী হতে পারে? বিশদে জানাচ্ছেন ডা. গৌতম মিস্ত্রী।

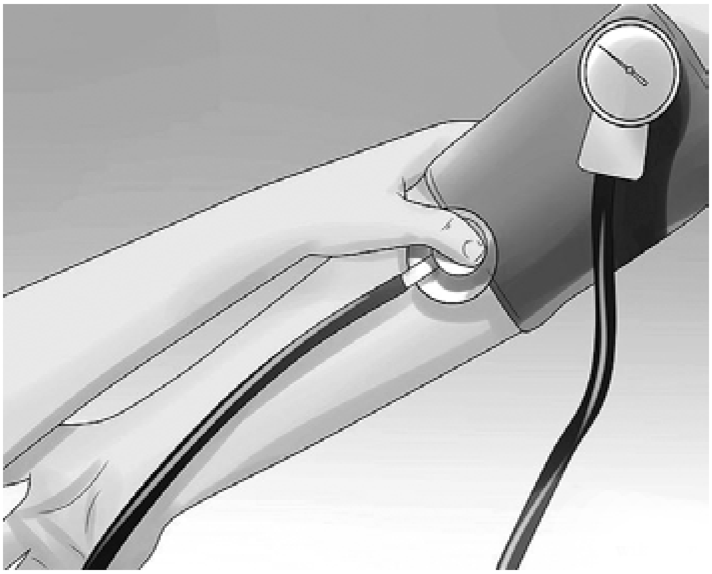

বিশ্বাসদা বীরেনবাবুর সহকর্মী। শুধু সহকর্মী বললে কম বলা হয়, বীরেনবাবুর পাশের টেবিলেই বসেন বিশ্বাসদা। বিশ্বাসদা অফিস ক্লাবের সেক্রেটারি, অফিসের আর ক্লাসের কাজকর্ম নিয়ে মেতে থাকেন, আর একা হাতে সামলেও রাখেন সব কিছু। ক-দিন ধরেই সেই বিশ্বাসদা চুপচাপ, খালি মাথা নীচু করে বসে আছেন। চা-ওয়ালা হারাধন জোরজার না করলে বীরেনবাবু অতটা পাত্তা দিতেন না, ভাবতেন বৌদির সঙ্গে আবার লেগেছে হয়তো। কিন্তু হারাধন যখন বলল, বিশ্বাসদা মাথাব্যথার ওষুধ কিনতে তাকে রোজই ওষুধের দোকানে পাঠাচ্ছেন, বীরেনবাবু বুঝলেন, গতিক সুবিধের নয়। অফিস ছুটির পরে বিশ্বাসদাকে নিয়ে গেলেন তাঁর পরিচিত এক ডাক্তারের কাছে। বিশ্বাসদার ব্লাড প্রেশার বেশ বেশি। তা দেখেই হঠাৎ কী খেয়াল হল বীরেনবাবুর, নিজের প্রেশারটাও মাপতে বললেন, আর সেটা করতে গিয়েই চক্ষু চড়কগাছ। বীরেনবাবুর ব্লাড প্রেশার বিশ্বাসদার চেয়েও বেশি। বীরেনবাবুর চোখ চড়কগাছে চড়তে দেখে ডাক্তার আর একবার প্রেশার মাপলেন। বীরেনবাবুর ব্লাড প্রেসার তাতে কমল না। ডাক্তারবাবু দু-জনকেই ওষুধের নিদান দিলেন। সপ্তাহখানেক বাদে দু-জনেরই রক্তচাপ স্বাভাবিক হল, কিন্তু বিশ্বাসদার মাথাব্যথা কমল না, আর বীরেনবাবু যেমনটি ছিলেন তেমনই রইলেন। বিশ্বাসদা ওষুধ খাবার ইচ্ছে হারিয়ে ফেললেন আর বীরেনবাবু প্রেশার মাপার মেশিন আর ডাক্তারের বিচক্ষণতা, এদুটোকেই সন্দেহের চোখে দেখে ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দেবেন কিনা ভাবতে ভাবতে একদিন ডাক্তারের চেম্বারে 'পুনরাগমনায় চ'।

স্বাস্থ্যবিষয়ে কিছু ধ্যানধারণা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অবচেতনেই গড়ে ওঠে। গাড়ির চাকার প্রেশার আর রক্তনালীর প্রেশার সমগোত্রীয় বলে মনে হতে থাকে। সাধারণ অথবা উচ্চশিক্ষিত, কারোরই রক্তচাপ সম্পর্কিত প্রথাগত জ্ঞানলাভের সুযোগ হয়ে ওঠে না। খবরের কাগজের আর টেলিভিশনের বিজ্ঞাপনের একপেশে ভীতিকর তথ্যে এবং রাস্তার মোড়ের জড়িবুটিওয়ালার স্টিরিওফোনিক অভিনয়ে রক্তচাপ সম্পর্কে এক অসম্পূর্ণ ও ভয়ের ধারণা তৈরি হয়েই যায়। এর সঙ্গে অফিস কলিগ, বাসের সহযাত্রী, পাড়া-পড়শি ও নিজের পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে পাওয়া রক্তচাপের যাবতীয় খবরাখবর মিলে যে ধারণাটা তৈরি হয়ে ওঠে তার সঙ্গে ঠিক বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্যের বিস্তর ফারাক। মাথা ঘোরার রোগের (ভারটাইগো) অন্যতম কারণ হল কানের মধ্যেকার ককলিয়ার রোগ, কিন্তু মাথা ঘুরলে প্রেশার কমে গেছে মনে করে প্রেশার মাপার জন্য ছোটাছুটি পড়ে যায়। অনেক সময়ে সেই মুহূর্তে প্রেশার মাপার সুযোগ না থাকলে রক্তচাপ কমে গেছে ধরে নিয়েই রক্তচাপ বাড়ানোর টোটকা হিসাবে নুন-জল গেলা শুরু হয়ে যায়। এটা জেনে নেওয়া যাক, গুটিকয় প্রাণঘাতী রোগ ছাড়া (যেমন বড়ো ধরনের হার্ট অ্যাটাক), রক্তচাপের ওষুধ (বেশি মাত্রায়) না খেলে রক্তচাপ বিপদসীমার নীচে নামে না। অর্থাৎ আপাত-সুস্থ মানুষের শুধুশুধু রক্তচাপ কমে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। রক্তচাপ একটি জৈবিক প্রক্রিয়ার মাত্রার মাপ। মানুষের উচ্চতা, ওজন, চুলের দৈর্ঘ্য ইত্যাদির মাপের মতো ব্যক্তিবিশেষের রক্তচাপের মাত্রা কোনো স্থির সংখ্যা নয়।

রক্তচাপের গোড়ার কথা

বীরেনবাবুর মনে খুঁতখুতুনি আর যায় না। শেষমেষ ওই ডাক্তারকেই চেপে ধরলেন: ''ডাক্তারবাবু আমার ব্লাড প্রেশার বাড়ল, কিন্তু কিছু জানতেই পারলাম না। আর ওষুধ ক-দিন খেয়ে আপনি বললেন, প্রেশারটা কমে গেছে, চিন্তা নেই, কিন্তু ওষুধটা ছাড়বেন না, খেয়ে যান। তখনও আমি নিজে কিচ্ছু বুঝলাম না। এটা কেমন করে হয়? বিশ্বাসদা বোঝেন, প্রেশার বেড়েছে বলে তাঁর মাথা ধরে, আমার কিছু মালুমই হয় না। এও কি সম্ভব?''

ডাক্তারবাবু এমন আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। রক্তের চাপের চিকিৎসা করে এসেছেন এতদিন, কিন্তু রক্তের চাপের ইতিবৃত্ত? সে তো কবে মেডিক্যাল কলেজে পড়েছেন, আর মোদ্দা ব্যাপারটা জানা থাকলেও ইতিহাসে অনার্স বীরেনবাবুকে সেটা সহজ বাংলায় কেমন করে বোঝাবেন।

চশমার কাচটা রুমাল দিয়ে মুছে ডাক্তারবাবু শুরু করলেন, ''রক্তচাপের কথা বলার সময় দুটো সংখ্যার উল্লেখ করা হয়ে থাকে। একটা বড়ো সংখ্যা, অপরটা ছোটো। যদি বলা হয়, কোনো ব্যক্তির রক্তচাপ ১২০/৮০, তার মানে ওই মানুষটার সিস্টোলিক রক্তচাপ ১২০ মিলিমিটার পারদস্তম্ভের চাপের সমান, আর ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ ৮০ মিলিমিটার পারদস্তম্ভের চাপের সমান। পারদস্তম্ভের উচ্চতার চাপ একটা পরিচিত চাপ মাপার

পদ্ধতি, যেমন সমুদ্রপৃষ্ঠে বায়ুমণ্ডলের চাপ ৭৬০ মিলিমিটার পারদস্তম্ভের চাপের সমান। সেই অর্থে রক্তের চাপ বায়ুমণ্ডলের চাপের তুলনায় অনেকটাই কম।”

বীরেনবাবুর একটি দো-চাকা আছে, মাঝে-মধ্যেই পেট্রোল পাম্পে নিয়ে সেটার চাকা দুটোয় হাওয়া ভরতে হয়। সুতরাং ইতিহাসে অনার্স বলে যে তিনি বায়ুচাপের ব্যাপারটা বুঝবেন না, তা নয়। প্রশ্ন তুললেন, ‘‘বুঝলাম না ডাক্তারবাবু। একটি বিশেষ গাড়ির টায়ারের চাপের উপযুক্ত মাপ একটাই হয়। রক্তচাপের বেলা একটাই মানুষের জন্য ওপর-নীচে দুটো সংখ্যা কেন?”

ডাক্তারবাবু দেখলেন, নাঃ, স্রেফ ফিজিক্সের ফ্লুইড-প্রেশারের কথায় ভবি ভুলবে না, ফিজিওলজি টানতেই হবে। অগত্যা তিনি বললেন, ‘‘তাহলে মানব শরীরের জটিল কার্যকলাপের কথা বলতে হচ্ছে। রক্তের কাজ কী? এক অর্থে আমাদের রক্তনালীগুলো হল নদীপথের মতো, একটা পরিবহণ ব্যবস্থা। আর রক্তরস তথা জলীয় অংশ থেকে শুরু করে তার নানা কোষ হল এক-একটা মালবহনের ছোট্ট নৌকো। রক্ত একটা পরিবহণ পরিষেবার কাজ করে। আমাদের বিভিন্ন অঙ্গের ক্রিয়াকলাপের জন্য শক্তির প্রয়োজন। শক্তি উৎপাদনের জন্য দরকার কাঁচা মাল। সেই কাঁচা মাল অর্থাৎ শক্তি উৎপাদনকারী গ্লুকোজ ও অক্সিজেন বিভিন্ন অঙ্গে পৌঁছে দেবার কাজটা ‘‘রক্ত-সরবরাহ ব্যবস্থা” (circulatory system) নামক দেহের পরিবহণ তন্ত্রের মাধ্যমে হয়।

হৃদ্‌যন্ত্র বা হৃৎপিণ্ডের কাজ হল রক্ত পাম্প করা। রক্ত পাম্প করে ধমনির মাধ্যমে হৃদ্‌যন্ত্র সারা শরীরে পৌঁছে দেয়। যে রক্তটা হৃদ্‌যন্ত্র পাম্প করবে, সেই রক্তটা শিরার মাধ্যমে শরীরের অন্য সব জায়গা থেকে হৃদ্‌যন্ত্রে এসে পৌঁছোয়। হৃদ্‌যন্ত্র হল মোটা মাংসল স্তর দিয়ে তৈরি ফাঁপা একটা বলের মতো জিনিস, মাঝখানে কিছু দেওয়াল ও ভালভ আছে। হৃদ্‌যন্ত্রের কাজের দুটো পর্যায় আছে। একটা হল প্রসারণ পর্যায়, যে সময়ে রক্ত শিরা বেয়ে এসে হৃদ্‌যন্ত্রে জমা হবে, আর সেই রক্তকে ঠাঁই করে দেবার জন্য হৃদ্‌যন্ত্র খানিক ফুলবে, অর্থাৎ প্রসারিত হবে। তার পরের পর্যায়ে হৃদ্‌যন্ত্র সংকুচিত হবে, আর সেই সংকোচনের ফলে হৃদ্‌যন্ত্রের ভেতরের রক্তের ওপর পড়বে চাপ, তখন রক্ত ছুটবে ধমনি বেয়ে দেহের সর্বত্র। অবশ্য হৃদ্‌যন্ত্রের সব অংশ সমানভাবে বা একসঙ্গে সংকুচিত-প্রসারিত হয় না, পর্যায়ক্রমে হয়। এখানে হৃদ্‌যন্ত্রের সংকোচন বলতে মূলত নিলয়ের সংকোচন বোঝাচ্ছি আমি, আর হৃদ্‌যন্ত্রের প্রসারণ বলতে বোঝাচ্ছি মূলত নিলয়ের প্রসারণ। কিন্তু সে সব বোঝাতে গেলে অনর্থক জটিল হয়ে পড়ে ব্যাপারটা . . .”

সিস্টোল ও ডায়াস্টোল

‘‘তা না হয় নাই বুঝলাম, কিন্তু এসবের সঙ্গে রক্তচাপের কম-বেশি দুটো মান হবার কী সম্পর্ক?” বীরেনবাবু এবার অধৈর্য।

‘‘সাইকেলের টায়ারে হাওয়া দিয়েছেন কখনো? হ্যান্ডপাম্প দিয়ে?” আলতো করে জবাবি প্রশ্ন ডাক্তারবাবুর। তারপর উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই শুরু করেন তিনি, ‘‘যখন সাইকেলের টায়ারে হাওয়া দেবার জন্য হাতপাম্পটায় জোরে চাপ লাগান, তখন কেউ পাম্পের নলটা একটু ধরে দেখলেই বুঝবে, সেটা ফুলে উঠছে। এমনকী ধরে দেখারও দরকার নেই, ভালো করে তাকিয়ে দেখলে দেখা যাবে যখনই পাম্পটা দিয়ে হাওয়া দেওয়া হচ্ছে, তখনই পাম্পের রাবার-নলটা ফুলে ফুলে উঠছে। দু-বার হাওয়া দেবার মাঝখানের সময়টাতে নলটা ফুলে উঠছে না। যদি আপনি রক্তচাপ মাপার একটা যন্ত্র দিয়ে ওই নলের মধ্যেকার হাওয়ার চাপ মাপতে পারতেন, তাহলে দেখতেন ফুলে ওঠার সময় চাপ বেশি দেখাচ্ছে, আর যখন হাতপাম্পের হ্যান্ডেলটা ওপরে তুলে ধরছেন, চাপ লাগাচ্ছেন না, তখন নলের মধ্যেকার হাওয়ার চাপ কম।

আমাদের সিস্টোলিক-ডায়াস্টোলিক প্রেশারটাও সেরকম। যখন হৃদ্‌যন্ত্র সংকুচিত হয়ে রক্তকে ঠেলে ধমনির মধ্যে দিয়ে বাইরে পাঠাচ্ছে, তখন চাপ বেশি। সেটাকে আমরা বলব ‘সিস্টোলিক প্রেশার’, কেন না হৃদ্‌যন্ত্রের সংকোচনকে বলে ‘সিস্টোল’। দুটো সিস্টোলের মাঝের সময়টায় হৃদ্‌যন্ত্রের গহ্বর প্রসারিত হয়, সেটাকে বলে ‘ডায়াস্টোল’। সেই সময়টা সাইকেলের হাতপাম্পটার হ্যান্ডেল ওপরে তোলার সময়ের সঙ্গে তুলনীয়। অর্থাৎ সেই সময়ে ধমনির ওপরে চাপ পড়ছে কম, আর সেই কম চাপটাই হল ‘ডায়াস্টোলিক প্রেশার’।”

‘‘তা ওই ‘ডায়াস্টোলিক প্রেশার’ ব্যাপারটার দরকারটা কী? আপনি তো আমার প্রেশার মাপতে গিয়ে বললেন আমার ডায়াস্টোলিকটা বেশি। ডায়াস্টোলিক প্রেশার জিনিসটা যদি আদৌ না থাকত তা হলে কী এসে যেত?” প্রশ্ন বীরেনবাবুর।

‘‘সাইকেলে হাতপাম্পের তুলনাটা পুরোপুরি খাটে না অবশ্য, কেননা আপনি যখন হাতপাম্পের হ্যান্ডেলটা ওপরের দিকে তুলছেন, তখন রাবার নল দিয়ে হাওয়া কোনদিকে যাচ্ছে সে নিয়ে আমাদের চিন্তা করতে হয় না, সাইকেলের টিউবের মুখে এমন একটা ব্যবস্থা আছে যার ফলে টিউব থেকে হাওয়া বেরিয়ে কখনোই পাম্পের দিকে যাবে না। কিন্তু হৃদ্‌যন্ত্রের ক্ষেত্রে তা নয়। যখন হৃদ্‌যন্ত্র সংকুচিত হচ্ছে, মানে ডায়াস্টোল, তখনও ধমনির রক্ত হৃদ্‌যন্ত্র থেকে দূরের দিকেই যাবে; তবে সিস্টোলের সময়ের মতো অত দ্রুত যাবে না, ধমনির দেওয়ালের গায়ে অত চাপও দেবে না। তাই ‘ডায়াস্টোলিক প্রেশার’ থাকবে, কিন্তু সেটা সবসময়েই সিস্টোলিক প্রেশারের চাইতে কম হবে।”

ডায়াস্টোলিক চাপ বাড়ে কেন?

‘‘আমার ডায়াস্টোলিক চাপ বেশি কেন?” বীরেনবাবুর প্রশ্ন।

‘‘এক কথায় বলতে গেলে আপনার ‘পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স’ বেশি বলে। আরে দাঁড়ান দাঁড়ান, উত্তেজিত হবে না, উত্তেজিত হলে অ্যাড্রেনালিন বেরোবে, আর আপনার পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স আরও বেড়ে যাবে। সহজ বাংলা করেই বলছি।

মনে করা যাক, একই পরিমাণের রক্ত মোটা ও সরু এই দুই ধরনের রক্তনালীর মধ্য দিয়ে হৃদ্‌যন্ত্র একই শক্তি প্রয়োগ করে পাম্প করে যাচ্ছে। মোটা রক্তনালীর মধ্যে রক্ত তাড়াতাড়ি প্রবাহিত হবে, কিন্তু সেই রক্ত প্রবাহ রক্তনালীর দেওয়ালে কম চাপ সৃষ্টি করবে। অন্যদিকে রক্তনালী সরু হওয়ার জন্য রক্ত প্রবাহে বেশি বাধা সৃষ্টি হবে, অপেক্ষাকৃত কম মাত্রায় রক্ত প্রবাহ হবে আর রক্তনালীর দেওয়ালে বেশি পরিমাণের চাপ সৃষ্টি হবে। রক্তনালীর সরু হওয়া ও আরও কিছু বৈশিষ্ট্যের জন্য রক্তপ্রবাহে

বেশি বাধাদানের ক্ষমতা থাকে, ফলে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়। আগেই বলেছি, দুই হৃদ্‌স্পন্দনের মধ্যবর্তী সময়েও রক্ত ধমনি বেয়ে সামনের দিকে, অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের থেকে দূরের দিকেই প্রবাহিত হতে থাকে; তবে সেই সময়ে রক্তচাপ ক্রমাগত কমতে কমতে একটা সর্বনিম্ন মানে নেমে আসে, সেটাই ডায়াস্টোলিক প্রেশার।

ডায়াস্টোলিক প্রেশারের একটা স্বাস্থ্যকর নিম্নসীমা আছে, কারণ হৃদ্‌যন্ত্রের নিজের ব্যবহারের জন্য অক্সিজেন ইত্যাদি বহনকারী রক্তনালী হল করোনারি ধমনি, সেটাকে ডায়াস্টোলের সময়ও রক্ত বহন করতে হবে, নইলে হৃদ্‌যন্ত্র কাজই করতে পারবে না। সিস্টোলিক ও ডায়াস্টোলিক, রক্ত চাপের এই দুই নন্দী-ভৃঙ্গিরই উপযুক্ত চাপ থাকা বাঞ্ছনীয়। রক্তের সঠিক চাপের ফলে রক্ত থেকে দেহের কোষের প্রয়োজনীয় রসদ ও অক্সিজেন রক্ত থেকে কোষে প্রবেশ করতে পারে আর কোষ থেকে অপ্রয়োজনীয় বর্জ্য পদার্থ রক্তে মিশতে পারে।

বীরেনবাবু হঠাৎ বলে উঠলেন, ‘‘তার মানে, রক্তনালী হল শহরের রাস্তা, বা আপনি যেমন বলেছিলেন, নদীপথ, আর রক্ত হল বাস বা নৌকো? আর স্রোত না থাকলে নৌকা এগোনোর বদলে পিছিয়ে পড়তে পারে। তাই তো?’’

ডাক্তার বললেন, ‘‘একদম তাই বলতে পারেন, হৃদ্‌যন্ত্র থেকে ধমনি বা ‘আর্টারি’ নামক নালী দিয়ে রক্ত বাইরের দিকে যায়, ধমনি দিয়ে কখনোই হৃদ্‌যন্ত্রে ফেরে না। ফেরে শিরা বা ‘ভেন’ দিয়ে। রক্তচাপ মাপার সচরাচর পদ্ধতিতে আমরা শিরার চাপ মাপি না, সবসময়েই ধমনির চাপ মাপি।

সিস্টোলিক ও ডায়াস্টোলিক রক্তচাপের একটা স্বাস্থ্যকর সীমা আছে। তার চেয়ে বেশি বেড়ে গেলে যে ভারি বিপদ সেটা বোঝা যায় রক্তচাপ বেশি হয়ে মস্তিষ্কের রক্তনালীর দেওয়াল ফেটে গেলে, সেটাকে আমরা বলি ‘স্ট্রোক’। রক্তচাপ বাড়লে এইসব হবার সম্ভাবনা বাড়ে বলেই তো রক্তচাপের চিকিৎসাকে এত গুরুত্ব দিই আমরা। এ ছাড়াও রক্তচাপ বাড়লে হৃদ্‌যন্ত্রকে পাম্প করতে হয় খুব বেশি শক্তি খরচ করে, কেননা পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স বেড়ে গেছে, রক্তনালীতে রক্ত চলাচল বেশি বাধার সামনে পড়ছে। এমন অবস্থায় হৃদ্‌যন্ত্রকে বেশি কাজ করতে হয়, তার বেশি পরিমাণে গ্লুকোজ আর অক্সিজেন দরকার হয়ে পড়ে। যেহেতু গ্লুকোজ আর অক্সিজেন আসে রক্ত থেকেই, তাই এসময় হৃদ্‌যন্ত্রের নিজের ব্যবহারের জন্য বেশি রক্তের দরকার হয়ে পড়ে। বেশি পরিমাণে রক্ত বয়ে নিয়ে যাবার জন্য হৃদ্‌যন্ত্রের মাংসপেশিতে রক্ত সরবরাহ করে যে হৃদ্‌ধমনি, তার ওপরে চাপ পড়ে। হৃদ্‌ধমনি যদি কোনো কারণে রোগগ্রস্ত থাকে তবে হৃদ্‌পেশিতে যথেষ্ট রক্ত সরবরাহ হয় না, ফল হল বুকে ব্যথার রোগ বা মায়োকার্ডিয়াল ইস্কিমিয়া রোগ। উচ্চ রক্তচাপের কারণে হৃৎপিণ্ডকে জোরে পাম্প করতে হয় বলে হৃদ্‌পেশিগুলিও মোটা হয়ে সমস্যার সৃষ্টি করে। ডাম্বেল ভেঁজে মোটা বাইসেপ্স আর ট্রাইসেপ্স পেশি বাগানো যেমন সুস্বাস্থ্যের, হৃদ্‌পেশি মোটা হওয়াটা তা নয়, সেটা বরং খারাপ স্বাস্থ্যের লক্ষণ। এ ছাড়া দীর্ঘকাল ধরে অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ-রক্তচাপের ফলে বৃক্ক বা কিডনির কর্মক্ষমতাও কমে যায়।

গুরুতর কোনো কারণ না হলে রক্তচাপ সাধারণত বিপদসীমার নীচে নেমে যায় না। কিন্তু তেমনটি হলে শরীরের নানা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, যেমন মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড ও কিডনির কাজ ভয়ানকভাবে ব্যহত হয়।’’

নিঃশব্দ ঘাতক

বীরেনবাবু এবার একটু ভয় পেলেন। প্রেশার তাহলে কেবল মাথা ব্যথার কারণ নয়।

ডাক্তার বলে চলেন, ‘‘উচ্চ রক্তচাপের ব্যারামকে তাই বিজ্ঞজনেরা ‘নিঃশব্দ ঘাতক বা silent killer’ বলেন। রোগীরা মাথাব্যথায় কাতর হলেও চিকিৎসকরা রোগীর ভবিষ্যতের সেরিব্রাল স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাক, কিডনির অনিরাময়যোগ্য রোগের কথা ভাবেন। তাই প্রেশারের ওষুধ জীবনভর খেয়ে যেতে বলেন।’’

বীরেনবাবু আবার ধাক্কা খেলেন। প্রশ্ন, সারাজীবন ধরে ওষুধ খেতে হবে কেন? ডাক্তারের স্মার্টফোনে অ্যালার্ম বেজে উঠল। উনি বললেন, ‘‘এক মিনিট, আমার প্রেশারের ওষুধটা খাবার সময় হয়েছে।’’

ওষুধটা খেয়ে বলতে থাকলেন, ‘‘উচ্চ রক্তচাপ আসলে নিজে কোনো রোগ নয়, মারাত্মক সব রোগ সৃষ্টি আগের অবস্থার মাত্র, এখনও পর্যন্ত এই উচ্চ রক্তচাপ পাকাপাকিভাবে স্বাভাবিক করে দেবার মতো কোনো চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয়নি। সঠিক মাত্রায় ওষুধ খেলে সাময়িকভাবে রক্তের চাপকে স্বাভাবিক করে রাখা যায়। আশার কথা, ওষুধের দ্বারা রক্তের চাপ স্বাভাবিক করে রাখতে পারলেই ওই সব মারণ রোগের হাত থেকে নিরাপদে থাকা যায়। বীরেনবাবু, আপনার উচ্চ রক্তচাপ ধরা পড়ল বিশ্বাসবাবুর কল্যাণে। কিন্তু এইরকম ঘটনা সবসময় ঘটবে এমন ভরসা তো করা যায় না। আপাত-সুস্থ মানুষের নিয়মিতভাবে একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর কিছু কিছু স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা উচিত। রক্তচাপ মেপে নেওয়াটাও সেই পরীক্ষা লিস্টের মধ্যে অন্যতম।’’

বীরেনবাবুর প্রশ্নের শেষ রাখতে চান না। বললেন, ‘‘সারাজীবন ধরে ওষুধ খেয়ে গেলে ওষুধের কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া মানে সাইড এফেক্ট হবে না?’’ ডাক্তার বললেন, ‘‘হতেই পারে। প্রায় সব ওষুধেরই কোনো-না-কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে। ডাক্তার বিচক্ষণ হলে মাঝে মধ্যে আপনার

রক্তের চাপ মেপে নতুন করে প্রেসক্রিপশন করার সময়ে এই ব্যাপারটা বিশেষ করে লক্ষ রাখেন।”

বীরেনবাবুর শেষ প্রশ্ন, “বিশ্বাসদার মাথা ব্যথার কী হবে? ওঁর প্রেশার তো ঠিক হয়ে গেছিল, কিন্তু মাথাব্যথা গেল না কেন?”

ডাক্তার বললেন, “মাথা ব্যথার অন্য কারণ থাকতে পারে। ওঁকে আবার পরীক্ষা করতে হবে। একটা কথা ওঁকে বলে দেবেন। উচ্চ রক্তচাপের কারণে মাথা ব্যথা খুব কম হয়। তেমনটি হলে মস্তিষ্কের রোগগ্রস্ত ও ভঙ্গুর রক্তনালী উচ্চচাপের জন্য ফেটে গেছে কিনা এইটা বড়ো প্রশ্ন হয়ে দেখা দেয় ডাক্তারের কাছে। মাথা ব্যথার কোনো মামুলি কারণ থাকলে সেটা অনেকক্ষেত্রে নিজের থেকেই কমে যায়। কাকতালীয়ভাবে মনে হয় রক্তচাপের ওষুধ খেয়ে কমেছে। সহ্যসীমার অধিক শারীরিক পরিশ্রম বা মানসিক টানাপোড়েনের কারণেও মাথা ব্যথা হতে পারে। রক্তচাপের ওষুধ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাধ্যতামূলক শারীরিক বিশ্রাম আরোপিত হয়, আগেকারের সেই টানাপোড়েন কমে যায় বা রক্তচাপের দুশ্চিন্তা আগেকারের দুশ্চিন্তাকে সাময়িকভাবে হঠিয়ে দেয়। অধিকাংশ সময় সেই কারণেই মাথা ব্যথা থেকে মুক্তি মেলে।”

বীরেনবাবু এতক্ষণে একটা ভরসার হাসি হাসলেন। বললেন, “বিশ্বাসদা-কে বিশ্বাস করানোর প্রাথমিক কাজটা তিনি করবেন। প্রয়োজন হলে “ডাক্তারবাবু, আর একবার এই কথাগুলো . . .।” স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. গৌতম মিস্ত্রী, এমবিবিএস, এমডি, ডিএম, কার্ডিওলজিস্ট।
প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

Advt.

শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ ও সুন্দরবন কমপ্রিহেনসিভ এরিয়া ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ সেন্টার-এর যৌথ উদ্যোগে কেনা হল একটি মোটর চালিত নৌকা।

সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকে রোগী পরিবহণ ও মেডিক্যাল টিমের যাতায়াতের জন্য ব্যবহৃত হবে এই যানটি।

এই নৌকাটি কেনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছেন দেশ বিদেশে থাকা শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগের বন্ধুরা।

ট্যুরিস্ট সিজ্‌নে নৌকাটিকে ভাড়া দিয়ে উপার্জিত অর্থে সুন্দরবন সীমান্ত স্বাস্থ্য পরিষেবার খরচ চালানো হবে।

কম খরচে সুন্দরবন ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন—

উৎপল মণ্ডল, সুন্দরবন কমপ্রিহেনসিভ এরিয়া ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ সেন্টার, ফোন: ৯০৮৮০৫০৫২৫, ৯০৭৭৯৩৩৩২

Advt.

মিডিয়া কবলমুক্ত, তথ্যনিষ্ঠ বিশ্ব-বিশ্লেষণের ত্রৈমাসিক সম্ভার

বাংলা মান্থলি রিভিয়ু

স্বাধীন মার্কসবাদ-চর্চার অনন্য পত্রিকা

যোগাযোগ: বই-চিত্র, কলেজস্ট্রিট, কফি হাউস, কলকাতা ৭০০০৭৩

মুঠোফোন: ৯৪৭৭৪৩৩৩৫২
৯৮৩০৮৪৭১৫৯

বইমেলায় প্রকাশিত হচ্ছে: পিট সিগার ক্রোড়পত্র

কোন বয়সে কীসের টিকা কেন দেব?

ডা. স্বপন বিশ্বাস

কোন বয়সে কোন টিকা দেব সহজভাবে জানাতে হলে এক পাতার একটা লিস্ট ছাপিয়ে দিলে ল্যাটা চুকে যায়। কিন্তু কেন ওই বয়সে ওই টিকা দেব—সে কথা জানতে গেলে বা বুঝতে গেলে আবার মহাভারত হয়ে যাবে। এর মাঝামাঝি একটা জায়গায় গিয়ে আমরা বোঝার চেষ্টা করব, কোন বয়সে কোন টিকা কেন দেব?

এখানেও সেই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কথা আসবে। কীভাবে শরীরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কাজ করে, তার একটা ধারণা আগের বার দেওয়া হয়েছে, এবার আরও একটু বলতে হবে, না হলে বুঝতে অসুবিধা হবে। সংক্ষেপে বলি।

প্রতিরক্ষার যে সহজাত বা জন্মগত ব্যবস্থা আছে, (Innate immunity) তার প্রধান কুশীলব হল—

১. চামড়ার প্রতিরোধ এবং

২. বিভিন্ন রাক্ষস কোষ (যেমন নিউট্রোফিল, ম্যাক্রোফেজ, মোনোসাইট, কিলার লিম্ফোসাইট ইত্যাদি)।

এরা আক্রমণকারী অ্যান্টিজেনের জাত গোত্র বিচার না করে যাকে পায় তাকেই ধ্বংস করে। এদের মধ্যে ম্যাক্রোফেজ আর ডেনড্রাইটিক কোষ আবার সেই অ্যান্টিজেনকে ধরে নিয়ে লিম্ফ নোড নামক সেনা ক্যান্টনমেন্টে বসে থাকা লিম্ফোসাইটের কাছে পৌঁছে দেয়। সেখানে তৈরি হয় দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রতিরক্ষা—বা অর্জিত প্রতিরক্ষার (Adaptive immunity) কেরামতি। তার প্রধান কুশীলব লিম্ফোসাইট।

রক্তের সব কোষের উৎপত্তি হয় অস্থিমজ্জায়, অল্প কিছু তৈরি হয় লিভার ও অন্য জায়গায়। কিছু লিম্ফোসাইট তৈরি হবার পরে 'থাইমাস' নামক গ্রন্থিতে ঢুকে যায়। সেখান থেকে তারা তাদের শরীরে বা গায়ে কিছু ফাঁদ বা সেনসর নিয়ে বের হয়, যাকে 'রিসেপ্টর' বলে। এর ফলে তারা বিশেষ কিছু গুণাবলি অর্জন করে, যেন কিছু অস্ত্র লাভ করে। এভাবে পরিণত হবার পর তাদের বলা হয় টি-লিম্ফোসাইট। 'টি' কথাটি থাইমাস থেকে এসেছে।

বি-লিম্ফোসাইট অবশ্য তৈরি হবার পরে অস্থিমজ্জাতে পরিণত বা Mature হয়।

পরিণত লিম্ফোসাইট এর পরে রক্তে ঢুকে যায়, সেখানে ঘুরে ফিরে বেড়ায় এবং পিলে বা প্লিহা (spleen) এবং আরও বিভিন্ন লসিকা গ্রন্থি (Lymph node) বা সৈনিক ক্যান্টনমেন্টে স্থায়ীভাবে থাকতে শুরু করে।

সৈনিক ক্যান্টনমেন্ট (Lymph gland)

আমরা যে সব কোষ নিয়ে আলোচনা করছি বা করব, তাদের প্রত্যেকেই সৈনিকের মতো শরীরকে রক্ষা করে, তাই তারা যেখানে বেশি সংখ্যায় থাকে, খায়-দায়-বড়ো হয় সেটাই তাদের ক্যান্টনমেন্ট। যেমন প্লিহা (spleen) ও লসিকা গ্রন্থি (Lymph node)।

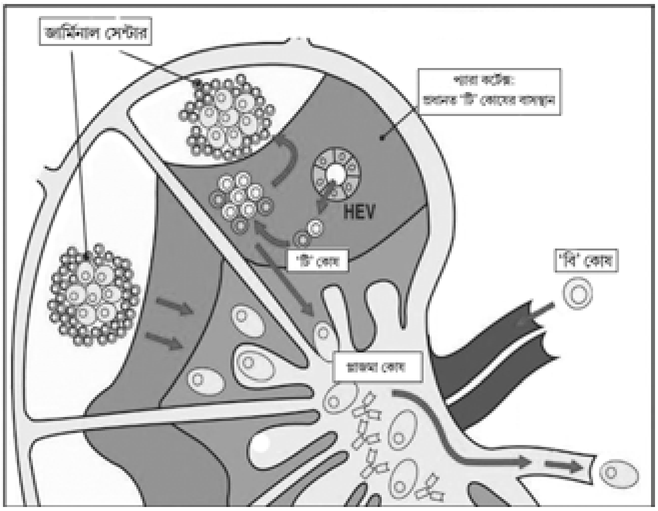

চিত্র ১. লিম্ফনোড বা লসিকা গ্রন্থি মেডালা

প্লিহা বা স্প্লিন (spleen) অনেক বড়ো গ্রন্থি এবং শরীরে একটাই থাকে। তবে লিম্ফ নোড বা লসিকা গ্রন্থি থাকে অনেক। এখানেই লিম্ফোসাইটগুলো বেশি থাকে, তাই এদেরই আমরা সৈনিক ক্যান্টনমেন্ট বলছি। এখানে অনেক ধরনের কোষ দল বেঁধে নিয়মনীতি মেনে নিজের জায়গায় বসবাস করে।

এবার একটু সৈনিক ক্যান্টনমেন্টে ঘুরে আসব। দেখি সেখানকার সমরসজ্জা। এই ক্যান্টনমেন্টে থাকে 'বি' ও 'টি' লিম্ফোসাইট আর ডেনড্রাইটিক কোষ এবং ম্যাক্রোফেজ। আর থাকে বি-লিম্ফোসাইট থেকে তৈরি হওয়া কিছু প্লাজমা কোষ, যারা অ্যান্টিবডি তৈরি করে।

ক্যান্টনমেন্টে ঢোকার রাস্তা আছে—রক্ত বা লসিকা দিয়ে কোনো কিছু ঢুকে প্রথম যে ঘরে বা যে অঞ্চলে যায়, তার নাম মেডুলা। এর বোধহয় কোনো বাংলা হয় না, তাই ইংরাজি নামই লিখব। সেখানে বসে থাকে প্লাজমা কোষ আর ম্যাক্রোফেজ। আগেই বলেছি, ম্যাক্রোফেজ অ্যান্টিজেন ধরে খেয়ে ফেলে আর কিছুটা নিয়ে দেয় টি-লিম্ফোসাইট ও বি-লিম্ফোসাইটকে। আর প্লাজমা কোষ অ্যান্টিবডি তৈরি করে জীবাণু মারার ব্যবস্থা করে।

তার পরের যে অঞ্চল, তার নাম প্যারাকর্টেক্স। এখানে টি-লিম্ফোসাইট ও ডেনড্রাইটিক কোষের বাস। এক ধরনের টি-লিম্ফোসাইট, জেলের কয়েদিদের নাম্বারের মতো এদের একটা নাম আছে—সি.ডি.-৪ (CD-4); উত্তেজিত হয়ে কিছু রাক্ষস টি-কোষ তৈরি করে, তাদের নাম সি.ডি.-৮ টি লিম্ফোসাইট (CD-8, or cytotoxic T cell), এরা জীবাণুকে খেয়ে ফেলে। আবার টি-৪ কোষ বি-লিম্ফোসাইটকেও উত্তেজিত করে। ডেনড্রাইটিক কোষও অ্যান্টিজেন ধরে নিয়ে বি-লিম্ফোসাইটকে দেয়।

বি-লিম্ফোসাইটের অঞ্চল তার পরের সারিতে এবং একদম শেষে। এই ঘরের নাম কর্টেক্স। টি-কোষ, বি-লিম্ফোসাইটকে উত্তেজিত করার ফলে বি-লিম্ফোসাইটের দু-রকম পরিবর্তন হয়। 'বি' কোষগুলি হঠাৎ করে যেন আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের কেরামতিতে সংখ্যায় বাড়তেই থাকে। ডেলিভারি রুমের মতো আলাদা একটা অঞ্চলে এরা থাকে, যার নাম ফলিকল (Follicle)। এখান থেকে অসংখ্য প্লাজমা কোষ তৈরি হয়—যারা অ্যান্টিবডি তৈরি করে। ফলিকলও অনেক বড়ো হয়। বেশির ভাগ প্লাজমা কোষ ৪-৮ সপ্তাহের পরে মারা যায়, কিন্তু কিছু কোষ বেঁচে থাকে। বেঁচে থাকা কোষের কিছু থাকে লসিকা গ্রন্থির কর্টেক্সে আর কিছু চলে যায় অস্থিমজ্জায়, সেখানে তারা দীর্ঘদিন বেঁচে থেকে শত্রুর অপেক্ষা করে।

বি-লিম্ফোসাইট আর তৈরি করে কিছু স্মৃতিধর বা Memory কোষ। তারা আবার ওই একই জীবাণু বা অ্যান্টিজেনের সংস্পর্শে এলে খুব তাড়াতাড়ি প্লাজমা কোষে পরিবর্তিত হয়ে অ্যান্টিবডি তৈরি করে ও জীবাণু ধ্বংস করে।

এই যে টি-কোষের দ্বারা বি-কোষকে উত্তেজিত করে যে প্রতিরক্ষা তৈরি হল, তাকে ডাক্তারি ভাষায় বলে—Cell mediated immunity। বা বলা যায় **কোষ মধ্যস্থতাকারী প্রতিরক্ষা**। কারণ একটি কোষের দ্বারা আরেকটি কোষকে উত্তেজিত করে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়।

সি.ডি-৪ (CD-4) টি-লিম্ফোসাইট ছাড়াও বি কোষ উত্তেজিত হতে পারে এবং প্লাজমা কোষ তৈরি করে অ্যান্টিবডি ক্ষরণ করতে পারে, কিন্তু সে ক্ষেত্রে কোনো মেমারি কোষ তৈরি হয় না, প্লাজমা কোষও অস্থিমজ্জায় গিয়ে দীর্ঘজীবী হয় না। শুধু তাৎক্ষণিকভাবে তখনকার মতো প্লাজমা কোষ তৈরি হয়। প্লাজমা কোষ প্রথমে তৈরি করে আইজি এম (IgM) অ্যান্টিবডি, তাদের আয়ু বেশিদিন নয়, তারপরে তৈরি করে আইজিজি (IgG) অ্যান্টিবডি, তারা শরীরে অনেকদিন থেকে শরীরকে রক্ষা করে। একসময় অবশ্য তারাও কমতে থাকে এবং শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়।

আগের সংখ্যার লেখাটা (''টিকা কীভাবে কাজ করে'', *স্বাস্থ্যের বৃত্তে*, অক্টোবর-নভেম্বর ২০১৫ সংখ্যা)। জটিল ছিল, এটা আরও জটিল। ধৈর্যশীল ও অনুসন্ধিৎসু পাঠক ছাড়া আমাকে ক্ষমা করতে পারবেন না জানি, তবুও আমি শুধু সেই জায়গাটায় পৌঁছাতে চাইছি, যতটুকু জানলে বোঝা যায় কোন টিকা কোন বয়সে কেন দেব। আর কিছু নাম (যেমন সি.ডি.-৪ (CD-4) টি-লিম্ফোসাইট) বর্তমান এইডস রোগের সঙ্গে এতটাই জড়িয়ে, এর নাম বা কাজ জানা না থাকলে এইডস নিয়ে কোনো ধারণা করা যাবে না।

ফের কথায় আসি। তাহলে আমরা দেখলাম, বি-কোষ থেকে প্লাজমা কোষ তৈরিই আসল অ্যান্টিবডি-মাধ্যমে প্রতিরক্ষা কারণ এভাবে প্লাজমা কোষ দীর্ঘস্থায়ীভাবে অ্যান্টিবডি তৈরি করে। সারসংক্ষেপে—

- টি-কোষের সাহায্য ছাড়াও প্লাজমা কোষ তৈরি হয়, তবে তা স্বল্পস্থায়ী।
- টি-কোষে যখন বি-কোষকে উত্তেজিত করে, তখন শুধু প্লাজমা কোষই তৈরি হয় না, তৈরি হয় স্মৃতিধর (memory) কোষ। প্লাজমা কোষও লসিকা গ্রন্থি ও অস্থিমজ্জায় দীর্ঘস্থায়ী হয়, ফলে প্রতিরক্ষা হয় দীর্ঘমেয়াদি।
- যেসব জীবাণু কোষের ভিতরে বাসা বাঁধে (যেমন টি.বি.-র জীবাণু), তাদের ক্ষেত্রে টি-কোষের সাহায্য ছাড়া কোনো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাই তৈরি হয় না।

কোন টিকা কীভাবে কাজ করে?

এতক্ষণ আমরা যা জানলাম, তা হল শরীরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। এবার আসব টিকা কী, কীভাবে তৈরি হয়, কীভাবে সেই টিকা শরীরকে রক্ষা করে সেই আলোচনায়।

আগেই বলেছি, টিকার উপকরণ হতে পারে

- রোগের জীবিত জীবাণু (কিন্তু রোগ তৈরি করার ক্ষমতাহীন),
- মৃত জীবাণু, বা
- জীবাণুর কোনো অংশবিশেষ।

সেই মতো টিকাকেও কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

১. জীবাণুর শরীরের অংশ নিয়ে তৈরি করা টিকা (subunit vaccine)

- হেপাটাইটিস-বি
- হেপাটাইটিস-এ
- HiB (Hemophilus)
- ইনফ্লুয়েঞ্জা (Influenza)
- মেনিংগোকক্কাল (Meningococcal)।

এরা রাসায়নিক চরিত্রগতভাবে দু-রকম হতে পারে।

ক. শুধুমাত্র পলিস্যাকারাইড গোত্রের হতে পারে।

যেমন:
- S. pneumoniae
- N. Meningitidis
- H. influenza
- S. Typhi

এই টিকা টি-কোষকে উত্তেজিত করে না, শুধুমাত্র বি-কোষকে উত্তেজিত করে, ফলে যে প্লাজমা কোষ তৈরি হয়, তারা এক সময়ে ধ্বংস হয়ে যাবার পর আর কোনো স্মৃতিধর কোষ থাকে না। তাই এক সময় টিকার প্রতিরক্ষা নষ্ট হয়ে যায়। দু-বছর বয়সের আগে এই টিকা ভালো কাজ করে না, কারণ তখনও লসিকা গ্রন্থির গঠন সব অংশে সম্পূর্ণ হয় না।

দ্বিতীয়বার এই টিকা দিলেও কোনো মেমারি কোষ না থাকায় বেশি অ্যান্টিবডি তৈরি হয় না, আগের মতো অথবা তার চেয়েও কম হয়।

তবে কৃত্রিমভাবে এর সঙ্গে কোনো প্রোটিন যুক্ত করে দিলে যে টিকা তৈরি হয়, তা টি-কোষকে উত্তেজিত করতে পারে। তখন প্রতিরক্ষা হয় দীর্ঘস্থায়ী। তখন এই টিকাকে বলা হয় Conjugated vaccine, বাংলায় সংযুক্ত টিকা বলতে পারি। যেমন: HiB, Meningococcal, Pneumococcal. [এই নামগুলোর বাংলা করা মুশকিল, বড়ো জোর ইংরাজি কথাগুলো বাংলায় লিখে দেওয়া যায়। তাই নামগুলো ইংরাজিতেই রাখলাম।

খ. প্রোটিন গোত্রের হতে পারে

যেমন:
- হেপাটাইটিস-বি
- হেপাটাইটিস-এ
- টক্সয়েড-জীবাণু থেকে নেওয়া কোনো ক্ষরিত বা বিষাক্ত পদার্থ।
- HPV

যে সমস্ত টিকা রাসায়নিকভাবে প্রোটিন গোত্রের, তারা সাহায্যকারী টি-কোষের (CD-4) সাহায্যে বি-কোষকে উত্তেজিত করে কোষ মধ্যস্থতাকারী

প্রতিরক্ষা (Cell mediated immunity) ব্যবস্থা কায়েম করে, ফলে প্রতিরক্ষা দীর্ঘস্থায়ী ও বেশি কার্যকরী হয়। এক্ষেত্রে স্মৃতিধর কোষ তৈরি হয়, প্লাজমা কোষও দীর্ঘস্থায়ীভাবে অস্থিমজ্জায় থেকে যায়। সংযুক্ত গোত্রের টিকাও একইভাবে কাজ করে।

২. মৃত জীবাণু: মৃত জীবাণু আবার দু-রকম হতে পারে

- সম্পূর্ণ মৃত জীবাণু যেমন হুপিং কাশি।
- জীবাণুর টক্সিন/টক্সয়েড-টিটেনাস বা ডিপথিরিয়া

মৃত জীবাণু সংখ্যায় বাড়তে পারে না, তাই যেখানে টিকা দেওয়া হয়, শুধুমাত্র সেখানকার লসিকা গ্রন্থিতে এর প্রতিরক্ষা তৈরি হয়। এজন্য এক সঙ্গে একাধিক টিকাকরণ করা যায়। বিভিন্ন স্থানে টিকা দিতে হয়। কোনোটা বাঁ হাতে তো কোনোটা ডান পায়ে, এরকম।

৩. রোগ তৈরির ক্ষমতাহীন জীবিত জীবাণু:

- বি.সি.জি. (টিবির জন্য)
- খাওয়ানোর পোলিও (OPV)
- হাম (Measles)
- এম. এম. আর
- চিকেন পক্স।

জীবাণু যেহেতু জীবিত থাকে, তাই তারা শরীরের মধ্যে গিয়ে বংশ-বিস্তার করে, শরীরের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে যায়। ফলে শরীর বার বার সেই জীবাণু থেকে অ্যান্টিজেন পায় এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সব সময় উত্তেজিত হয়ে কার্যকরী থাকে। তবে কোনো কারণে প্রথমবার টিকাকরণ ঠিকমতো না হলে, বা জীবাণু ঠিক না থাকলে কোনো প্রতিরক্ষাই তৈরি হবে না। তাই যদিও একবার টিকাকরণই যথেষ্ট, তবুও আর একবার বা দ্বিতীয়বার এই টিকাকরণ করতে হয়, যাতে প্রথমবারে কোনো অসুবিধা হলেও দ্বিতীয়বারে নিশ্চিত হওয়া যায়। এইজন্য এই টিকা ২ বার দেওয়া উচিত।

- যেকোনো ক্ষেত্রে প্রথমবার টিকাকরণের পরে যে প্রতিরক্ষা গড়ে ওঠে, তাকে ইংরাজিতে বলে Primary immune response, বাংলায় আমরা বলতে পারি প্রাথমিক প্রতিরক্ষা সাড়া।
- বুস্টার-এর অর্থ হল শরীরে দ্বিতীয়বার ওই একই জীবাণু বা অ্যান্টিজেন দ্বারা টিকাকরণ করা। ফলে কোষ মধ্যস্থতাকারী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরও জোরদার, কার্যকরী ও দীর্ঘস্থায়ী হয়। একে ইংরাজিতে বলে Secondary immune response, বাংলায় বলা যেতে পারে, মাধ্যমিক প্রতিরক্ষা সাড়া।

জীবিত জীবাণু যেহেতু শরীরের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে যায় এবং প্রায় ৪ সপ্তাহ ধরে এর প্রাথমিক প্রতিরক্ষা তৈরি হতে থাকে, এই ৪ সপ্তাহের মধ্যে অন্য জীবিত জীবাণুর টিকা দিলে প্রতিরক্ষার কাজ ব্যাহত হয়—তাই একবার এই ধরনের টিকাকরণের পর ৪ সপ্তাহ আগে অন্য জীবিত জীবাণুর টিকা দেওয়া উচিত নয়। অবশ্য একই সঙ্গে বা একই দিনে একাধিক জীবিত জীবাণুর টিকা দেওয়া যায়, তাতে কোনো অসুবিধা হয় না।

জানা দরকার

১. প্রাথমিক প্রতিরক্ষা সাড়া: কী ধরনের টিকা ব্যবহার করা হচ্ছে, তার উপরে নির্ভর করে প্রাথমিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কতটা মজবুত হল। সবচেয়ে কম হয় পলিস্যাকারাইড ধরনের টিকায়, তারপর প্রোটিন বা সংযুক্ত টিকায়, এবং সবচেয়ে বেশি হয় জীবিত জীবাণুর টিকায়।

২. জীবিত জীবাণু ছাড়া প্রোটিন ধরনের টিকার ক্ষেত্রে প্রাথমিক প্রতিরক্ষার জন্য বার বার টিকা দেওয়া হয়। তবে এর একটি নির্দিষ্ট ব্যবধান থাকা দরকার। প্রথম টিকার ১ মাস পরে দ্বিতীয় টিকা, ৬ মাস পরে তৃতীয় টিকা দিলে দেখা গেছে সবচেয়ে বেশি মজবুত প্রতিরক্ষা তৈরি হয়। কোথাও আবার ৬-১০-১৪ সপ্তাহ বা ২-৩-৫ মাস বা ২-৪-৬ মাসের ব্যবধান চালু আছে। তবে সবচেয়ে ভালো ০-১-৬ মাসের ব্যবধান। কারণ মেমারি বা স্মৃতিধর বি-কোষ তৈরি করতে ৪-৬ মাস সময় লাগে।

৩. স্মৃতিধর কোষ যদিও তাড়াতাড়ি জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে, তবু ৪-৭ দিন সময় লাগে। যেসব রোগের জীবাণু শরীরে প্রবেশ করে ৪-৭ দিনের আগেই রোগ তৈরি করতে পারে, সেক্ষেত্রে (যেমন টিটেনাস, ডিপথিরিয়া) নিয়মিত বুস্টার দিয়ে যেতে হবে, যাতে শরীরে অ্যান্টিবডির পরিমাণ যথেষ্ট থাকে। একবার টিকা দেওয়া আছে বলে নিশ্চিন্তভাবে বসে থাকলে হবে না। হেপাটাইটিস-এ-র ক্ষেত্রে এই Incubation period বেশি বলে কোনো নিয়মিত বুস্টার না দিলেও চলবে। আবার, ডিপথিরিয়া, টিটেনাস ইত্যাদি রোগের ক্ষেত্রে, আগে টিকা (টক্সয়েড) যথাযথভাবে দেওয়া না থাকলে, প্রয়োজনে 'প্যাসিভ ইমিউনাইজেশন' করতে হয়। প্যাসিভ ইমিউনাইজেশনে জীবাণু-বিরোধী অ্যান্টিবডি শরীরে ইঞ্জেকশন করে ঢোকানো হয়।

কম বয়সে প্রতিরক্ষা ঠিকমতো গড়ে ওঠে না, কারণ মায়ের রক্ত থেকে প্রায় সব ধরনের রোগের অ্যান্টিবডি, প্রধানত 'জি' (IgG) অ্যান্টিবডি শিশুর শরীরে প্রবেশ করে। যখনই কোনো জীবাণু বা অ্যান্টিজেন শরীরে ঢোকে, তখন এই অ্যান্টিবডি গিয়ে তাকে আগে ধরে নেয়, ফলে শিশুর শরীরের বি-কোষের সঙ্গে এদের সংযোগ কম হয়, তাই প্লাজমা কোষ কম তৈরি হয়, শিশু নিজে যথাযথ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে না। জীবিত জীবাণুর ক্ষেত্রে মায়ের অ্যান্টিবডি জীবাণু ধ্বংস করে ফেললে বিশেষ কোনো প্রতিরক্ষা তৈরিই হয় না। তবে টি-কোষের (CD-4) কাজ কম বয়সেও ঠিকমতো চলে।

কম বয়সে প্লিহা ও লসিকা গ্রন্থির গঠনেও কিছু অপূর্ণতা থাকে, তাই প্রতিরক্ষাও কম হয়।

এই সমস্যা মেটাতে শিশুকে বার বার প্রাথমিক টিকাকরণ করা হয় এবং পরে বুস্টার দেওয়া হয়। এই জন্যে অনেকবার পোলিও টিকা খাওয়ানো হয়।

কিছু কিছু রোগ আছে, শিশুদের পক্ষে যা মারাত্মক এবং প্রাণঘাতী। তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার জন্যে, অল্প প্রতিরক্ষা হবে জেনেও অল্প বয়সে শিশুর টিকাকরণ শুরু করতে হয়। এমনিতে ২ মাস বয়স থেকে শুরু করা উচিত, কিন্তু আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে, যেখানে রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি, সেখানে ৬ সপ্তাহ অর্থাৎ দেড় মাস থেকেই টিকাকরণ শুরু করা হয়।

- হেপাটাইটিস-বি, ডি.পি.টি., মেনিঞ্জাইটিস (HiB), নিউমোকক্কাল, ইত্যাদির প্রাথমিক ডোজ জন্মের পর পর বা ৬ সপ্তাহে দেওয়া হয়। তারা তখনকার মতো কোনো প্রতিরোধ ব্যবস্থা তৈরি করতে পারে না। তবে যেহেতু টি-কোষ কাজ করে, তাই তখন থেকেই মেমারি কোষ তৈরি শুরু

হয়ে যায়, পরের ডোজ প্রতিরক্ষার জন্য যথেষ্ট অ্যান্টিবডি তৈরি করতে পারে। ১৮ মাসে এসব ক্ষেত্রে অবশ্যই বুস্টার ডোজ দিতে হবে, যাতে প্রতিরক্ষা দীর্ঘস্থায়ী হয়। টিকাকরণ পরে শুরু করলে প্রাথমিক ডোজের সংখ্যাও কম দিলে চলে। যেমন ৬ মাসের পরে ২ ডোজ প্রাথমিক, তারপরে বুস্টার। আবার এক বছরের পরে ১-২ ডোজ প্রাথমিক, তারপরে বুস্টার।
৫. কখনো কখনো শিশু কিছু জন্মগত প্রতিরক্ষা-প্রতিবন্ধকতা নিয়ে জন্মাতে পারে, তাদের ক্ষেত্রে ঠিকমতো প্রতিরক্ষা তৈরি হবে না।
৬. এইডস-এর জীবাণু এক ধরনের ভাইরাস। এরা সাহায্যকারী টি-কোষ (CD-4)-কে ধ্বংস করে, ফলে এরা একেবারে প্রতিরক্ষার কারখানাকেই নষ্ট করে দেয়, তাই শরীরের আর কোনো প্রতিরোধ ব্যবস্থা থাকে না। তখন অন্য জীবাণু শরীরকে আক্রমণ করে—দীর্ঘদিন ভুগতে ভুগতে মানুষ একসময় মৃত্যুবরণ করে। এইজন্য এইডসে আক্রান্তদের রক্তের সি.ডি.-৪-টি কোষের সংখ্যা নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করা হয়।

বর্তমান যে যে টিকা পাওয়া যায়

যেকোনো টিকা আবিষ্কারের পরে তা নিয়ে অনেক পরিক্ষানিরীক্ষার পরে মানব শিশুর শরীরে প্রয়োগের ছাড়পত্র মেলে। আমাদের দেশে যে-সব টিকা বর্তমানে প্রয়োগের ছাড়পত্র মিলেছে, সেগুলো হল

১. বি.সি.জি. (টিবি রোগের জন্য)
২. পোলি (পোলিও রোগের জন্য)
৩. হেপাটাইটিস-বি (হেপাটাইটিস-বি রোগের জন্য)
৪. ডি.পি.টি. (ডিপথিরিয়া, পারটুসিস বা হুপিংকাশি ও টিটেনাস বা ধনুষ্টংকার রোগের জন্য)
৫. এইচ. আই. বি. (HiB) (মেনিঞ্জাইটিস, নিউমোনিয়া আরও নানাবিধ রোগের জন্য)
৬. নিউমোকক্কাল (মেনিঞ্জাইটিস, নিউমোনিয়া, কানের ও আরও নানাবিধ রোগের জন্য)
৭. রোটা ভাইরাস (শিশুদের আন্ত্রিক বা ডায়রিয়া রোগের জন্যে)
৮. এম. এম. আর (হাম, মাম্পস ও রুবেলা রোগের জন্যে)
৯. চিকেন পক্সের টিকা
১০. হেপাটাইটিস-এ (হেপাটাইটিস-এ রোগের জন্যে)
১১. টাইফয়েড (টাইফয়েড রোগের জন্যে)
১২. প্যাপিলোমা ভাইরাস টিকা (HPV) (মেয়েদের জরায়ু ক্যান্সার রোগ-প্রতিরোধের জন্যে)
১৩. বিভিন্ন সংযুক্তক টিকা
১৪. ইনফ্লুয়েঞ্জা টিকা
১৫. জাপানিজ এনকেফেলাইটিস টিকা
১৬. মেনিঙ্গোকক্কাল টিকা (শিশুদের নানারকম রোগ সৃষ্টিকারী মেনিঙ্গোকক্কাল জীবাণুর জন্য টিকা)
১৭. জলাতঙ্কের টিকা
১৮. কলেরার টিকা
১৯. ইয়োলো ফিভারের টিকা

আর একটি রোগের টিকা আগে দেওয়া হত, স্মল পক্স বা গুটি বসন্তের টিকা। টিকার মাধ্যমে এই রোগ পৃথিবী থেকে নির্মুল করা গেছে, তাই এখন আর এই টিকা দেওয়া হয় না।

আরও নানারকম জীবাণুর টিকা আবিষ্কারের প্রস্তুতি বা গবেষণা চলছে। তার মধ্যে ম্যালেরিয়া ও এইডস অন্যতম। আশা করা যায় একদিন আরও অনেক টিকা আবিষ্কার হবে।

এখানে একটা কথা বলা দরকার, আমাদের সরকারি দপ্তর সব টিকা দেয় না। কারণ হতে পারে আমাদের সঙ্গতির অভাব বা তুলনামূলকভাবে কিছু রোগ আমাদের দেশে কম হয় তাই। কিন্তু তাই বলে কোনো টিকা দেবার প্রয়োজনীয়তা কমে যায় না। কিছু সংখ্যক ডাক্তারও আছেন, যারা বলেন ও সব দেবার দরকার নেই। এ কথাও কোনো বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তির কথা নয়, বরং ডাক্তারদের উচিত যতটা সম্ভব টিকাকরণের বিস্তার ঘটানো এবং সম্ভব হলে সব রকমের টিকা দানে উৎসাহিত করা।

যেসব টিকার কথা বলা হল, তাদের নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আমরা ধীরে ধীরে করব। এবার দেখব ভারত সরকারের টিকাকরণ কর্মসূচিতে বর্তমান কী কী টিকার সুপারিশ করা হয়েছে। নীচের সারণিতে দিলাম।

এক বছরের নীচে শিশুদের জন্য

বিসিজি	জন্মের সময় বা যত শীঘ্র সম্ভব একবছর বয়সের মধ্যে
হেপাটাইটিস বি	জন্মের সময়, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে
মুখে খাবার পোলিও টিকা, ০ ডোজ	জন্মের সময় বা যত শীঘ্র সম্ভব-১৫ দিনের মধ্যে
মুখে খাবার পোলিও টিকা, ১, ২, ৩ ডোজ	৬, ১০ ও ১৪ সপ্তাহ বয়সে
ডিপথেরিয়া, হুপিং কাশি ও টিটেনাস-মিলিত টিকা, ১, ২, ৩ ডোজ	৬, ১০, ও ১৪ সপ্তাহ বয়সে
হেপাটাইটিস ‘বি’, ১, ২, ৩ ডোজ হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জি ‘বি’ টিকা (ডিপথেরিয়া, হুপিং কাশি ও টিটেনাস, হেপাটাইটিস ‘বি’ ও হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জি ‘বি’—এই ৫টি একসঙ্গে মিলিত টিকা-পেন্টাভ্যালেন্ট ভ্যাক্সিন-হিসেবেও দেওয়া হতে পারে)	৬, ১০ ও ১৪ সপ্তাহ বয়সে
জাপানিজ এনকেফেলাইটিস ১ম ডোজ	৯ মাস
মামস্‌, হাম, রুবেল ১ম ডোজ	৯ মাস পূর্ণ থেকে ১২ মাস বয়স পর্যন্ত হল সঠিক সময়

এক বছরের ওপরে শিশুদের জন্য

ডিপথেরিয়া, হুপিং কাশি ও	১৬ থেকে ২৪ মাস বয়সে

টিটেনাস—মিলিত টিকা, বুস্টার ডোজ	
মামস্ এবং রুবেলা ২য় ডোজ	১৬ থেকে ২৪ মাস
হাম	১৬ থেকে ২৪ মাস কিন্তু আগে দেওয়া না হয়ে থাকলে ৫ বছর বয়স পর্যন্ত দেওয়া চলতে পারে।
মুখে খাবার পোলিও টিকা, বুস্টার ডোজ	১৬ থেকে ২৪ মাস বয়সে
জাপানিজ এনকেফেলাইটিস টিকা ২য় ডোজ	১৬ থেকে ২৪ মাস বয়সে
ডিপথেরিয়া, হুপিং কাশি ও টিটেনাস-মিলিত টিকা, বুস্টার ডোজ	৫ থেকে ৬ বছর বয়সে
হুপিং কাশি ও টিটেনাস-মিলিত টিকা, বুস্টার ডোজ	১০ বছর বয়সে, আবার ১৬ বছর বয়সে

* ভিটামিন 'A' - সামগ্রিকভাবে ৯টি ডোজ। প্রথম ডোজ ৯ মাস বয়সে তারপর ৬ মাস অন্তর অন্তর। ৫ বৎসর পয়স পর্যন্ত ভিটামিন 'A' কোনো টিকা নয়। কিন্তু জাতীয় টিকাকরণ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত।

* জাতীয় টিকাকরণ কর্মসূচিতে ইনজেক্টেবল পোলিও টিকা দেওয়ার ব্যাপারে সরকারি স্তরে ভাবা হয়েছে কিন্তু এখনও হয়নি। উপযুক্ত সময়ে তার update করা হবে।

জাতীয় টিকাকরণ কর্মসূচি মাঝে মধ্যে পরিবর্তন করা হয়; এ ছাড়াও কখনো কখনো স্থানীয় প্রয়োজনে রদবদল করা হয় (যেমন জাপানিজ এনকেফেলাইটিস টিকা—এই রোগের প্রাদুর্ভাব আছে এমন অঞ্চলে দেওয়া শুরু হয় ও পরে এই এলাকা বাড়ানো হয়)। তাই ঠিক কী কী টিকা ঠিক কখন লাগাতে হবে, এর সামান্য কিছু পরিবর্তন হয়ে থাকতে পারে। এ ছাড়া গর্ভাবস্থায় মা-কে দেওয়া টিটেনাস টিকা, মায়ের সঙ্গে নবজাতকের টিটেনাস আটকায়। প্রথম সন্তানধারণের ক্ষেত্রে গর্ভসঞ্চারের প্রথম দিকে প্রথম টিটেনাস টিকা, ও তার ৪ সপ্তাহ পরে দ্বিতীয় টিটেনাস টিকা দেওয়া হয়। পরবর্তী সন্তানধারণ ৩ বছরের মধ্যে হলে একটিমাত্র বুস্টার টিটেনাস টিকা দেওয়া হয়। কিন্তু দু-টি সন্তানধারণের মধ্যে ৩ বছরের বেশি ব্যবধান থাকলে দু-টি টিটেনাস টিকা (প্রথম সন্তানধারণের মতোই) দেওয়া হয়।

ইন্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অফ পিডিয়াট্রিসিয়ান (ভারতের শিশুবিশেজ্ঞদের অ্যাকাডেমি) আবার টিকাকরণের ব্যাপারে খানিকটা আলাদা তালিকা দিয়েছেন; তাতে টিকার সংখ্যা ও সময় কিছুটা আলাদা। **স্বাস্থ্যের বৃত্তে**

ডা. স্বপন বিশ্বাস, এমবিবিএস, ডিসি এইচ, এমডি, শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ।
প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

সম্পাদকীয় সংযোজন

প্রবন্ধলেখক ডা. স্বপন বিশ্বাস বলেছেন, ''আমাদের সরকারি দপ্তর সব টিকা দেয় না। কারণ হতে পারে আমাদের সঙ্গতির অভাব বা তুলনামূলকভাবে কিছু রোগ আমাদের দেশে কম হতে পারে তাই। কিন্তু তাই বলে কোনো টিকা দেবার প্রয়োজনীয়তা কমে যায় না। কিছু সংখ্যক ডাক্তারও আছেন, যাঁরা বলেন ওসব দেবার দরকার নেই। এ কথাও কোনো বিজ্ঞানমনস্ক কথা নয়, বরং ডাক্তারদের উচিত যতটা সম্ভব টিকাকরণের বিস্তার ঘটানো এবং সম্ভব হলে সব রকমের টিকাকরণের উৎসাহিত করা।''

এর ঠিক আগে ডা. স্বপন বিশ্বাস ''বর্তমানে যে যে টিকা পাওয়া যায়'' এই শিরোনামে অনেকগুলো টিকার কথা বলেছেন। সেই তালিকার মধ্যে ১২ নম্বরে আছে ''প্যাপিলোমা ভাইরাস টিকা (HPV) (মেয়েদের জরায়ু ক্যানসার রোগের জন্য)।''

আমরা খুব সুনির্দিষ্টভাবে মনে করি, ''হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস (HPV) টিকা মেয়েদের জরায়ু ক্যানসার প্রতিহত করতে পারে'', এমন প্রমাণ নেই। এই ব্যাপারে *স্বাস্থ্যের বৃত্তে*-র বিগত একটি সংখ্যায় (*স্বাস্থ্যের বৃত্তে*, প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০১১) আমরা বিশদ আলোচনা করেছি। আর পাঁচটা ওষুধের মতোই টিকাও ওষুধ কোম্পানির লাভের একটা পথ; তাই যে যে টিকা বাজারে ছাড়পত্র পেয়ে আসবে সেই সব টিকাই আমাদের দিতে হবে, এটা একদেশদর্শী মত। হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস (HPV) টিকা একটা উদাহরণ মাত্র। মূল কথা হল, টিকা মাত্রেই বৈজ্ঞানিক, উপকারী ও তা নেওয়া অবশ্যকর্তব্য, এই ধারণার ভিত্তি নেই।

তা বলে আমরা টিকাকরণের উপকারিতা সামগ্রিকভাবে অস্বীকার করি না, আমরা মনে করি অনেকগুলো টিকা আমাদের পক্ষে উপকারী ও প্রয়োজনীয়। কোন টিকা প্রয়োজনীয় আর কোনটা অপ্রয়োজনীয়, সেটা কে বলে দেবে? আমাদের কাছে এই মুহূর্তে সব থেকে নির্ভরযোগ্য সংস্থা হল সরকারি নীতিনির্ধারক সংস্থা। আমরা বলি না যে এই সংস্থা সমস্ত বাণিজ্যিক বা অন্যান্য চাপের উর্ধ্বে; আমরা জানি এই দেশে সেটা হওয়া সম্ভব নয়। তবু, যেহেতু টিকাকরণ ব্যাপারে একটা জাতীয় গাইডলাইন থাকার খুব দরকার, নইলে এক্ষেত্রে যথেচ্ছাচার চলবে, যেটা আরও অনেক ক্ষতিকর, তাই আমরা সরকারি টিকাকরণ প্রোগ্রাম মেনেই টিকা দেবার পক্ষে। ইন্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অফ পিডিয়াট্রিসিয়ান একটি অতীব মান্য সংস্থা, কিন্তু সরকারের যেমন জনগণের কাছে আইনি দায়বদ্ধতা আছে, এবং ব্যক্তি-চিকিৎসকেরও সরকারি স্বাস্থ্যনীতি মেনে চলার আইনি দায়বদ্ধতা আছে; ইন্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অফ পিডিয়াট্রিসিয়ান-এর ক্ষেত্রে এইরকম দায়বদ্ধতা নেই।

টুকরো খবর

বেশিক্ষণ বসে কাজ করলে লিভারের রোগ হতে পারে

অনেকক্ষণ বসে বসে কম্পিউটারে কাজ করেন? অফিসের কাজে ডুবে থাকেন ডেস্কে ঘণ্টার পর ঘণ্টা? নাকি টিভির পোকা, অথবা টেবিলে বসে পড়াশোনা করতে করতে নাওয়া-খাওয়া ভুলে যান? যাই হোক না কেন, বেশি বসে থাকা ভালো নয়। সেটা অবশ্য আমরা জানতাম অনেকদিন থেকেই। শারীরিক পরিশ্রম তেমন হয় না বলে মেদ বাড়ে, বাড়ে ডায়াবেটিস্ উচ্চ রক্তচাপ, হার্টের রোগের সম্ভাবনা; আর বসে থাকার জন্য মেরুদণ্ডে চাপ পড়ে বলে কোমরে ও ঘাড়ে ব্যথা হয়। কিন্তু নতুন দুঃসংবাদটা হল, বসে থাকলে আপনার লিভার বেগড়বাই করতে পারে, নন-অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ, বা সংক্ষেপে এনএএফএলডি, দেখা দিতে পারে। সুতরাং, সাধু সাবধান, যে শুইয়া থাকে তাহার ভাগ্যও শুইয়া থাকে হয়তো-বা, কিন্তু যে বসিয়া থাকে তাহার শরীরও দ্রুত বসিয়া যায়।

জার্নাল অফ হেপাটোলজি ১ লক্ষ ৪০ হাজার মধ্যবয়স্ক মানুষকে নিয়ে কোরিয়ার একটা সমীক্ষার ফল প্রকাশ করেছে। তাদের মধ্যে শতকরা ৩৫ জনের নন-অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ (এনএএফএলডি) দেখা গেছে। যাঁরা *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* (আগস্ট-সেপ্টেম্বর সংখ্যা) ডা. গৌতম মিস্ত্রীর লেখা 'স্নেহময় লিভারের ভার' পড়েছেন, তাঁদের এই রোগটা নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। এটা মেটাবলিক সিন্ড্রোম-এর একটা অংশ বলা যায়।

নতুন কথাটা হল, শারীরিক পরিশ্রম না করা আলাদা করে এনএএফএলডি-র সম্ভাবনা বাড়ায়, এবং অনেকক্ষণ ধরে বসে থাকাটাও আলাদা করে এনএএফএলডি-র সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। অর্থাৎ শারীরিক পরিশ্রম অনেকটা করলেও, যদি আপনি অনেকক্ষণ ধরে বসে থাকেন তো আপনার ওই সমস্যা হবার সম্ভাবনা বেশি; এমনকী আপনি বেশি মোটা না হলেও।

ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের নিউক্যাসেল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক মাইকেল ট্রেনেল-এর ভাষায়—

চিত্র ১. বহুদিন বেশিক্ষণ বসে কাজ করলে রোগা মানুষেরও এনএএফএলডি হতে পারে

"এর অর্থ খুব পরিষ্কার। আমাদের চেয়ার আমাদের ধীর ও নিশ্চিত মৃত্যুর কারণ। আমাদের শরীরের গঠন নড়েচড়ে বেড়ানোর উপযুক্ত করে তৈরি, তাই আমাদের বসে থাকার অভ্যাসের ফলে পেশির কাজ তেমন হয় না, সুতরাং শরীরের ওপর খারাপ প্রভাব পড়বেই।

নন-অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিস-এর ওষুধ কিছুই নেই। তাই জীবনযাত্রার পরিবর্তন হল আসল কথা। আমাদের কাছে এখন চ্যালেঞ্জ হল, আক্ষরিক অর্থে ও রূপকার্থে, উঠে দাঁড়ানো, ও নড়াচড়া করা।"

তথ্যসূত্র: *টাইমস অফ ইন্ডিয়া*, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ও http://www.medicalnewstoday.com/articles/299444.php

Advt.

প্রাথমিক চিকিৎসা, বিষক্রিয়া ও আহতের যত্ন

ডা. পুণ্যব্রত গুণ

ফাউন্ডেশন ফর হেলথ অ্যাকশন

প্রাপ্তিস্থান: শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ

বেলতলা, চেঙ্গাইল, হাওড়া

পক্ষাঘাতগ্রস্ত হাতের স্পর্শবোধ ফেরাল এক কৃত্রিম ব্যবস্থা

আমেরিকায় ২৮ বছর বয়সি এক ব্যক্তির পক্ষাঘাতগ্রস্ত হাতে স্পর্শ করার অনুভূতি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম সে অনুভূতি ফিরিয়ে আনল এক যন্ত্র-হাত (prosthetic hand)। সুষুম্না কাণ্ডে আঘাতের ফলে দশ বছরেরও বেশি আগে হাতটি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে; সেখানে স্পর্শ করলে মানুষটি তা বুঝতেই পারতেন না। কিন্তু যন্ত্র-হাত লাগানোর

চিত্র ১. পক্ষাঘাতগ্রস্ত হাতে স্পর্শ-অনুভূতি ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা

ফলে তাঁর কোনো আঙুলে আলগা করে হাত ছোঁয়ালেও তিনি এখন তা বুঝতে পারছেন। যন্ত্র-হাতটি বিদ্যুৎ-প্রবাহের সাহায্যে সরাসরি তাঁর মস্তিষ্কের সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে এটা সম্ভব হচ্ছে। মানব-মস্তিষ্ক তথা সমগ্র স্নায়ুতন্ত্রে খবর পরিবহণ হয় বিদ্যুতের মাধ্যমে, যদিও ইলেকট্রিক তার বেয়ে বিদ্যুৎ পরিবহণ আর স্নায়ুকোষ বেয়ে বিদ্যুৎ পরিবহণ—এ দুয়ের মধ্যে কিছু তফাত আছে।

মানব-মস্তিষ্কের বাইরের দিকের অংশ কর্টেক্স। সেই কর্টেক্সের আবার নানা অংশ। একটা অংশ হল সেনসরি কর্টেক্স বা সংবেদী কর্টেক্স—সেই অংশের সঙ্গে কৃত্রিম হাতের বিদ্যুৎ-সংযোগ এভাবে করা হয়েছে যে কৃত্রিম হাতে কোনো ধরনের স্পর্শ লাগলে সেটার সংকেত সংবেদী কর্টেক্সে পৌঁছে যায়। এমনভাবে সেই সংকেত পৌঁছোয় যে সংবেদী কর্টেক্স সেটাকে হাতে স্পর্শের অনুভূতি বলে ধরতে পারে, আর ঠিক কোন জায়গায় স্পর্শ করা হল সেটাও কিছুদূর পর্যন্ত বুঝতে পারে। ঠিক কোন কৃত্রিম আঙুলটায় স্পর্শ করা হল সেটা এই প্রযুক্তির কৃত্রিম হাত বুঝতে ভুল করে না একবারেই; যদিও তার চাইতে সূক্ষ্মতরভাবে স্পর্শের অনুভূতিস্থল বুঝতে ভুল করতে পারে।

উলটোদিকে, মানব-মস্তিষ্কের কর্টেক্সের আর একটা অংশ হল মোটর কর্টেক্স বা 'কাজ করার' কর্টেক্স—সেই অংশের সঙ্গে কৃত্রিম হাতের বিদ্যুৎ-সংযোগ এভাবে করা হয়েছে সেই কর্টেক্স থেকে কৃত্রিম হাত নানাভাবে নাড়ানো যাবে। ফলে সংবেদী কর্টেক্স কোনো অনুভূতি পেলে সেই অনুভূতির উপযুক্ত কাজ করতে পারবে মোটর কর্টেক্স। আমাদের যেকোনো কাজের এই দুটো অংশ—অনুভূতি পাওয়া, ও তার যথাযথ 'উত্তর' দেওয়ার মতো পেশি সঞ্চালন করা। টাইপ করবার সময়ে আমার আঙুল এসে লাগছে কী-বোর্ডের একটি কী-এর (চাবির) ওপর, সেই স্পর্শ পেয়ে আমি চাপ দিচ্ছি চাবিটিতে; তারপর সেই চাবিটি খানিকটা নামার অনুভূতি পৌঁছে যাচ্ছে আমার কাছে, তখন আমি আঙুল তুলে নিচ্ছি।

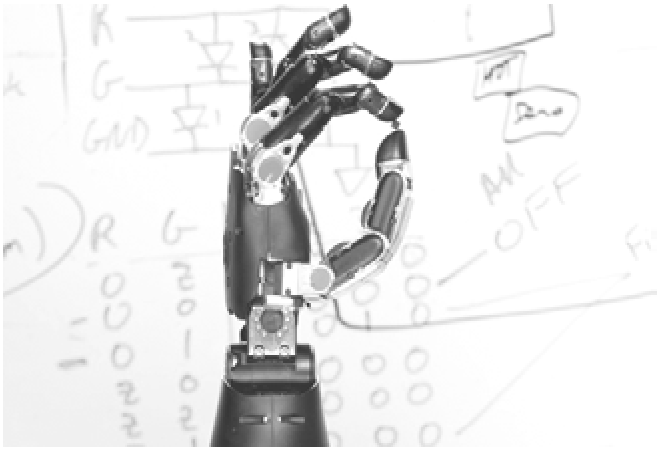

চিত্র ২. হাত বাদ গেছে এমন মানুষের জন্য 'বায়োনিক' হাতে স্পর্শ-অনুভূতি

দুর্ঘটনা বা অন্য কারণে হাত বাদ দেওয়া হয়েছে এমন মানুষের সংখ্যা প্রচুর। এই একই প্রক্রিয়ার খানিক অদল-বদল করে তাঁদের 'বায়োনিক' হাতে একইরকম স্পর্শ অনুভবের ক্ষমতা, ও সেই অনুসারে হাত নাড়ানোর ক্ষমতা, তৈরি করে দেওয়া যেতে পারে।

কৃত্রিম অঙ্গে স্পর্শের অনুভূতি ঠিকঠাক পাওয়া একটা বিরাট ব্যাপার। কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমরা এ ব্যাপারে আমাদের প্রকৃতিদত্ত হাতটির ক্ষমতার ধারেকাছেও পৌঁছোতে পারিনি। যেটুকু করা গেছে সেটা কম নয়, এবং পক্ষাঘাতগ্রস্ত বা অবশ অঙ্গে এই অনুভূতি পাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারলে রোগীদের বিরাট সুবিধা হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে এই ব্যবস্থায় এখনও অনেক সমস্যা রয়ে গেছে, এবং খুব শীগগিরই এই প্রযুক্তি আমাদের অনেকের কাজে লাগার মতো সহজপ্রাপ্য হবে, তাও নয়।

তথ্যসূত্র: *টাইমস অফ ইন্ডিয়া*, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ও http://edition.cnn.com/2015/09/15/health/prosthetic-hand-senses-touch

বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ অপুষ্টির শিকার

বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ মানুষ অপুষ্টির শিকার, আর প্রত্যেক দেশেই রয়েছে কিছু-না-কিছু এইরকম মানুষ—জানিয়েছে ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট। ব্যাপারটা এই নয় যে পৃথিবীতে মোট যতটা খাদ্য উৎপাদন হচ্ছে তা দিয়ে সব মানুষের ক্ষুধা মিটবে না। ঘাটতি রয়েছে মানুষের রোজগারে, ব্যবস্থাপনার দক্ষতায়, এবং রাজনৈতিক নীতি-প্রণয়নে। ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের লরেন্স হাদ্দাদ এই গবেষণাপত্রের মুখ্য লেখক। তিনি বলেছেন, ''যখন আমাদের তিনজনের মধ্যে একজন পিছিয়ে থাকে, তখন পরিবার, জনগোষ্ঠী এবং দেশও এগিয়ে যেতে পারে না।''

বাচ্চা বয়স থেকে বেঁটে হওয়া এবং রুগ্নতা হল অপুষ্টিজনিত সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম। পৃথিবীতে ১৬ কোটিরও বেশি শিশু অপুষ্টির কারণে তাদের বয়সের তুলনায় বেঁটে, আর ৫ কোটির বেশি শিশু তাদের উচ্চতার তুলনায়ও (যে উচ্চতা এমনিতেই কম) যথেষ্ট ওজনের নয়—এরা রুগ্ন।

একদিকে দেশে দেশে এই অপুষ্টি নিয়ে কম বা বেশি চেষ্টা হচ্ছে, খুব ধীরে হলেও কিছু সুফল ফলছে। কিন্তু অন্যদিকে স্থূলত্ব বা অতিপুষ্টি, যেটা অপুষ্টিরই আরেক রকমফের ছাড়া কিছু নয়, সেটা বেড়েই চলছে—জানিয়েছে গ্লোবাল নিউট্রিশন রিপোর্ট।

তথ্যসূত্র: *টাইমস অফ ইন্ডিয়া*, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫,

http://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/one-third-of-global-population-malnourished-study/articleshow/48985838.cms

http://blogs.ei.columbia.edu/2015/09/15upcoming-global-nutrition-report-highlights-role-of-climate/

কীটনাশক থেকে ডায়াবেটিস

কীটনাশক শরীরে গেলে ডায়াবেটিস হবার সম্ভাবনা বাড়তে পারে, এবং সাম্প্রতিক গবেষণা জানাচ্ছে সেই সম্ভাবনা-বৃদ্ধি নেহাত কম নয়। আগে করা ২১টি সমীক্ষার ফল একত্র করে নতুন এক গবেষণাপত্র জানিয়েছে, যেকোনো ধরনের কীটনাশকের সংস্পর্শে এলে ডায়াবেটিস হবার ঝুঁকি শতকরা ৬১ ভাগ বেড়ে যায়। গবেষকরা বলেছেন, কীটনাশকই ডায়াবেটিসের কারণ—এতটা তাঁরা বলতে চান না, এবং সেটা বলতে গেলে আরও সমীক্ষার প্রয়োজন আছে।

সব কীটনাশকে কিছু ঝুঁকি থাকলেও, সবার ঝুঁকি সমান নয়। ''আলাদা আলাদা করে কীটনাশকগুলো নিয়ে পরীক্ষা করলে মনে হয়, কয়েকধরনের কীটনাশক ডায়াবেটিস রোগের ঝুঁকি অন্যগুলোর চাইতে বেশি বাড়িয়ে দেয়।''— রিপোর্টটির লেখকরা এমনই বলছেন। ক্লোরডেন, অক্সিক্লোরডেন, ট্রান্স-নোনাক্লোর, ডিডিটি, ডিডিই, ডাইএলড্রিন, হেপ্টাক্লোর ও এইচসিবি—এরা ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বেশি বাড়ায়।

১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে স্টকহোমে 'ইউরোপিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি স্টাডি অফ ডায়াবেটিস'-এর বার্ষিক অধিবেশনে এই সমীক্ষাটি পেশ করা হয়। এ কথাটি বলা দরকার যে, এইরকম কোনো অধিবেশনে পেশ করা গবেষণাপত্রের চাইতে ভালো জার্নালে প্রকাশিত গবেষণাপত্রকে বেশি প্রামাণ্য বলে ধরা হয়ে থাকে। কিন্তু বিষয়টির গুরুত্ব এত বেশি যে এর মধ্যেই অনেক খবরের কাগজ ও টেকনিক্যাল লেখাতে এই সমীক্ষাটি উল্লেখিত হয়ে গেছে।

তথ্যসূত্র: *টাইমস অফ ইন্ডিয়া*, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫, p১৫ ও

http://www. webmd.com/diabetes/news/20150916/pesticide-exposure-tied-to-diabetes-risk

Advt.

রোগ নির্ণয়, রোগীর সেবাযত্ন ও ওষুধ নিয়ে কিছু তথ্য

ডা. পুণ্যব্রত গুণ

শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ

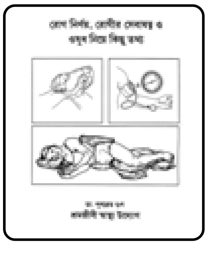

প্রাপ্তিস্থান: শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ
বেলতলা, চেঙ্গাইল, হাওড়া

পুস্তক সমালোচনা

শেষে আমরা কী চাই?

ডা. পুণ্যব্রত গুণ

Being Mortal
Medicine and What Maters in the End
Atul Gawande
Penguin, 2014

আমরা, চিকিৎসকরা মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে শিখি, ততদিন যতদিন সম্ভব। আমাদের শেখানো হয় না কীভাবে মানুষকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করতে হয়। কিন্তু বার্ধক্যে আর নিরাময়যোগ্য নয় এমন অনেক রোগে মানুষ অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হতে চান। চিকিৎসাবিজ্ঞান কি এই মানুষদের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আনবে না? পরিবর্তন যদি আনা হয় তাহলে কীরকম পরিবর্তন?

চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুহার কমেছে, মানুষের গড় আয়ু বেড়েছে, বেড়েছে প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ-বদ্ধাদের সংখ্যা। ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৬৫ বছর বা তার বেশি বয়সি মানুষেরা ছিলেন জনসংখ্যার মাত্র ২%, বর্তমানে ১৪%। জার্মানি, ইতালি ও জাপানে এমন বয়সিদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ২০%-এরও বেশি। চীনে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের মোট সংখ্যা ১০ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেশির ভাগ মানুষের মৃত্যু হত বাড়িতে। গত শতকের ৮০-র দশকে মাত্র ১৭% মৃত্যু বাড়িতে হত—বড়ো ধরনের হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক বা বড়ো দুর্ঘটনা, যে ক্ষেত্রে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় পাওয়া যায়নি। কিন্তু একই সময়ে বেড়েছে চিকিৎসার খরচও। তাই এই প্রশ্নগুলোকে এড়িয়ে যাওয়ার আজ আর উপায় নেই।

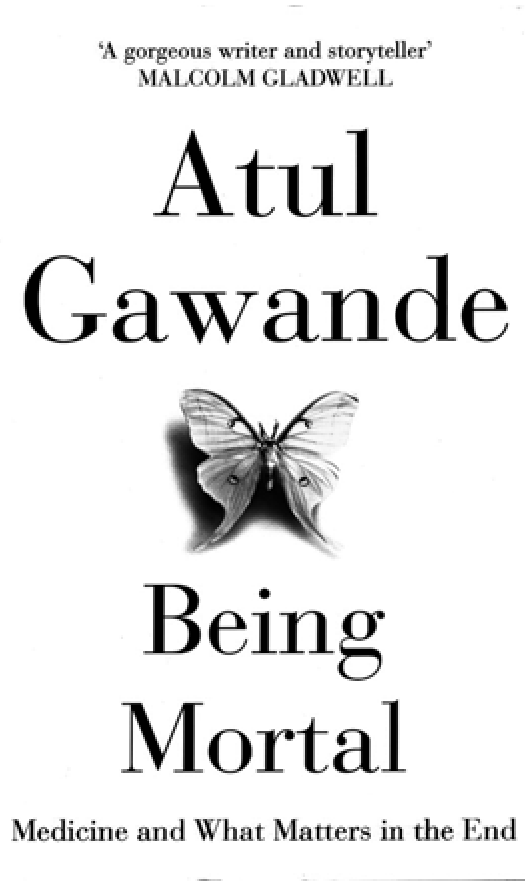

অতুল গাওয়ান্ডে একজন মার্কিন সার্জন। তাঁর বাবা-মা দু-জনেই অভিবাসী ভারতীয় চিকিৎসক। বাবা মহারারষ্ট্রের উটি নামের এক কৃষিজীবী পরিবারের সন্তান, পেশায় ইউরোলজিস্ট। মা ভারতের অন্য প্রান্তের, পেশায় শিশুরোগবিশেষজ্ঞ,। মেডিক্যাল স্কুলে অতুল অনেক কিছু শিখেছেন, কিন্তু মানুষের নশ্বরতা বা মৃত্যু সে শিক্ষার মধ্যে ছিল না। শিক্ষার প্রথম দিকে তিনি এক মৃতদেহ পেয়েছিলেন বটে, তবে তা ছিল কাটাকুটি করে শারীরস্থান (anatomy) শেখার জন্য।

মেডিক্যাল স্কুলে মৃত্যু নিয়ে প্রথম আলোচনা এক সাপ্তাহিক সেমিনারে, 'রোগী-ডাক্তার' শীর্ষক যে সেমিনারের লক্ষ্য ছিল মেডিক্যাল ছাত্র-ছাত্রীদের মানবিক করে তোলা। আলোচনা হয়েছিল টলস্টয়ের *দ্য ডেথ অফ ইভান ইলিচ* নিয়ে। ইভান ইলিচ ৪৫ বছর বয়স্ক এক ম্যাজিস্ট্রেট, সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে তাঁর কোমরে আঘাত লাগে, তিনি প্রচণ্ড ব্যথায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। একের পর এক ডাক্তার ডাকা হয়, একেকজন একেক রকম রোগ-নির্ণয় করে চিকিৎসা বাতলাতে থাকেন। কিন্তু কোনো লাভ হয় না, শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে ইভান মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন। তিনি জানেন যে তিনি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু না তাঁর বন্ধু বা পরিবার না তাঁর চিকিৎসকরা এই সত্যটাকে মেনে নিতে চান। তাঁরা মনে করেন এটা নিছকই একটা অসুখ। ইভানের কাছে ওঁদের এই ভানটাই সবচেয়ে কষ্টকর।

অতুল অনেক মৃত্যু দেখেছেন, দেখেছেন চিকিৎসক হিসেবে, দেখেছেন পরিবারে। সেই মৃত্যুগুলোর দিকে এগিয়ে যাওয়ার সুন্দর বিবরণ রয়েছে এই বইয়ে। যা থেকে বোঝা যায় কোন ধরনের মৃত্যু আমাদের কাম্য, কোন ধরনের কাম্য নয়। এই মৃত্যুগুলোর মধ্যে তিনটে লেখকের নিকটজনেদের।

অতুলের ঠাকুরদা সীতারাম গাওয়াণ্ডে মহারাষ্ট্রের উটি গ্রামের এক ধনী কৃষক। ১৮ বছর বয়সে তাঁর বাবা মারা যান দু-একর জমি আর ঋণের বোঝা রেখে। সীতারাম পরিশ্রম করে ঋণ শোধ করেন, দু-একর থেকে বেড়ে তাঁর জমির পরিমাণ হয় দু-শো একরেরও বেশি। অতুল যখন ঠাকুরদাকে দেখেন তখন তাঁর বয়স এক-শো বছরেরও বেশি, কুঁজো হয়ে লাঠিতে ভর দিয়ে চলেন, শোয়া-বসা থেকে উঠতে সাহায্য লাগে, কানে শুনতে পারেন না ভালো। তবু পরিবারে তাঁর স্থান উঁচুতে, বিবাহ-জমিজমা সংক্রান্ত বিবাদ, ব্যাবসা সব বিষয়ে তাঁর মত নেওয়া হয়। বহু বছরের অভ্যাসমতো রাতে ঘুমোনোর আগে কিন্তু তিনি ঘোড়ায় চড়ে একবার নিজের জমিজায়গা পরিদর্শন করে আসেন, এমনটা চলেছিল তাঁর ১১০ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু অবধি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাসিন্দা হলে কিন্তু সীতারামের স্থান হত নার্সিংহোমে।

যেমন হয়েছিল অ্যালিস হবসনের। সম্পর্কে অ্যালিস অতুলের দিদিশাশুড়ি, পত্নী ক্যাথলিনের ঠাকুরমা। সীতরামের চেয়ে বছর পঁচিশেক ছোটো অ্যালিস। তাঁর ৬০ বছর বয়সে তিনি হার্ট অ্যাটাকে স্বামীকে হারান। যদিও তাঁর ছেলে-বউ কাছেই থাকতেন তবু তিনি থাকতেন একা। এটাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দস্তুর। গত শতকের প্রথম দিকে ৬৫ বছরের বেশি বয়সি মানুষদের ৬০% থাকতেন কোনো সন্তানের সঙ্গে, ৬০-এর দশকে

অনুপাত কমে হয় ২৫%, ১৯৭৫-এ ১৫%। অ্যালিস থাকতেন স্বাধীনভাবে, নিজে বাগানের ঘাস ছাঁটতেন, সেলাই করতেন আত্মীয়-বন্ধুদের জন্য, বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন, নিজের গাড়ি নিজে চালাতেন। এমনটাই চলছিল তাঁর স্মৃতিভ্রংশের লক্ষণ দেখা দেওয়ার আগে অবধি, তারপর তাঁর স্থান হল এক বৃদ্ধাবাসে। পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারানোর পর তাঁর বন্দিজীবন শুরু হল নার্সিংহোমে। কোনো স্বাধীনতা নেই—কখন ঘুম থেকে উঠবেন, কখন স্নান করবেন, কখন খাবেন—সব অন্য কারোর ইচ্ছায়। ৮৬ বছর বয়সে মৃত্যু তাকে বন্দিদশা থেকে মুক্তি দিল।

এমনভাবে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হয়নি লেখকের বাবাকে। যখন তাঁর সত্তর পেরিয়েছে তখন ধরা পড়ে তাঁর সুষুম্নাকাণ্ডে ক্যানসার হয়েছে, ছড়িয়েছে মস্তিষ্কের নীচের অংশ অবধি, অপারেশন করে টিউমার বাদ দেওয়া যাবে না, স্নায়ুর ওপর চাপ একটু কমবে। প্রথমে রোগের উপসর্গ দেখে মনে হয়েছিল সারভাইকাল স্পন্ডাইলোসিস হয়েছে। তখন তিনি ইউরোলজি প্র্যাকটিসে ব্যস্ত, প্রচুর অপারেশন করেন। সপ্তাহে তিনদিন টেনিস খেলেন। স্থানীয় রোটারি ক্লাবের সভাপতি হওয়ার সুবাদে অনেক দাতব্য ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে যুক্ত। তা ছাড়া ভারতে তাঁর গ্রামে একটা কলেজ চালান তিনি, তাঁরই স্থাপন করা, ছাত্র-সংখ্যা ২০০০-এরও বেশি। ক্যানসার ধরা পড়ার পর দু-জন নিউরোসার্জন দেখেন তাঁকে। প্রথম জন অতুলেরই হাসপাতালের, তাঁর বক্তব্য ছিল তাড়াতাড়ি অপারেশন করিয়ে নেওয়া। দ্বিতীয় জন বিখ্যাত ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকের, একই অপারেশনের কথা বলেন তিনি, কিন্তু তাড়াহুড়ো করতে বারণ করেন, কেননা এই ধরনের টিউমার বাড়ে আস্তে আস্তে। অবশেষে তিনি অপারেশন করান রোগ ধরা পড়ার সাড়ে তিন বছর পর। এর মধ্যে অতুলের বাবা বাধ্য হয়েছেন ইউরোলজি প্র্যাকটিস ছেড়ে দিতে, টেনিস খেলা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। কিন্তু রোটারির প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন সুচারুভাবে, তিনি যখন থাকবেন না তখন গ্রামের কলেজ কেমন করে চলবে তার ব্যবস্থা করেছেন। অপারেশনের পর রেডিওথেরাপি-কেমোথেরাপিতে যখন ফল হল না তখন নতুন নতুন কেমোথেরাপির গিনিপিগ হতে অস্বীকার করেছেন। শেষটায় অসহ্য যন্ত্রণায় ভুগলেও নার্সিংহোমে ভর্তি হননি। বাড়িতে থেকেছেন, দরকার মতো বেদনানাশক মরফিন নিয়ে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বৃদ্ধদের অধিকাংশের শেষদিনগুলো আগে কাটত নার্সিংহোমে। তারপর এল অ্যাসিস্টেট লিভিং, হসপিস—এসব নিয়ে নানান পরীক্ষানিরীক্ষা। সেসবের ভালোমন্দ নিয়ে মনোগ্রাহী আলোচনা রয়েছে *Being Mortal*-এ। ভারতের বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্য ব্যবস্থা আছে যদি তাঁদের পয়সা থাকে। অসহায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বা মৃত্যুপথযাত্রীদের জন্য নয়া দিল্লিতে অতুলের দেখা নয়া দিল্লির গুরু বিশ্রাম বৃদ্ধাশ্রমের মতো ব্যবস্থা—এক পরিত্যক্ত গুদামঘরে ৬০ থেকে ১০০ বছর বয়সি শতাধিক মানুষের অযত্নে দিনাতিপাত।

এখানে ফের উঠে আসে *ইভান ইলিচের মৃত্যু*-র কথা। ইভান ইলিচ আসন্ন মৃত্যুর কথা ভেবে তীব্র মনোবেদনায় কাতর। অথচ কারোরই তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই। তিনি চান কেউ তাঁকে একটু দরদি মন নিয়ে দেখুক—রোগে-ভোগা বাচ্চার মতো মায়ের কোলে আদর খেতে চান, যাতে তাঁর মন ভালো হয়ে যায়। যাঁরা জানেন ‘মরতে চলেছি’ তাঁদের তখনকার ইচ্ছেগুলো অনেকটাই বদলে বদলে যায়। তবে সেসব ইচ্ছেপুরণ খুব একটা অসম্ভব নয়। কথাটা ইভানের পরিবার বা বন্ধুবান্ধব কেউই ধরতে পারেননি বা চাননি। কিন্তু বুঝেছিলেন ইভানের চাকর গেরাসিম।

তিনি দেখেছিলেন, ইভান ইলিচ ভুগছেন, কষ্ট পাচ্ছেন। সবসময়েই ভয়ে ভয়ে থাকছেন। দিন কাটাচ্ছেন একদম একা একা। যখন অন্যান্যরা ওঁকে এড়িয়ে চলেন, গেরাসিম কথাবার্তা চালান ইভান ইলিচের সঙ্গে। ইভান যখন বলেন তাঁর যন্ত্রণায় আরাম হয় যদি গেরাসিমের কাঁধে পা-টা তুলে দিতে পারেন। গেরাসিম সারা রাত ইভানের পা কাঁধে তুলে নিয়ে বসে থাকেন। একটু তো আরাম পাক লোকটা! ইভানকে কমোডে বসাতে, তারপর পরিষ্কার করতে তাঁর কোনো দ্বিধা হয় না। ইভান ইলিচের কোনো ইচ্ছেতেই তিনি বাধা দেন না। কোনো হিসাব-কিতাবের ধার না ধেরে তিনি অকপটভাবে ইভানের ছোটো ছোটো আবদারগুলো হাসিমুখে মেনে নেন। একটা ভালো মন নিয়ে সহজ সরলভাবে পুরোপুরি নিজের ইচ্ছায় গেরাসিম কাজগুলো করে যান। আর তা স্বাভাবিকভাবে ইভানের মনটাকে ছুঁয়ে যায়। অন্যের ভালো শরীর-স্বাস্থ্য, চনমনে ভাব দেখলে ইভানের বিচ্ছিরি লাগে কিন্তু গেরাসিমের অটুট স্বাস্থ্য, বল দেখে খারাপ তো লাগেই না বরং প্রাণটা যেন জুড়িয়ে যায়।

এই নেতিয়ে-পড়া মানুষজনের রোজের টিকে থাকায় যে ছোটোখাটো স্বস্তি দরকার, তাঁদের একাকীত্ব ঘোচানো দরকার, তাঁদের অতি তুচ্ছ ইচ্ছে পুরণে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া—এইসব আপাত-সহজ অথচ দরদি-সেবার প্রয়োজন ইভানের কালে যেমন ছিল, আজও তা সমানভাবেই আছে।

ডাক্তাররা মনে করেন মানুষকে সুস্থ রাখা আর বাঁচিয়ে রাখাই বুঝি তাঁদের কাজ। আসল কাজটা হল ভালোভাবে বেঁচে থাকতে সাহায্য করা। চিকিৎসাবিজ্ঞানের যে শাখা বয়স্কদের ভালোভাবে বেঁচে থাকতে সাহায্য করার বিষয়ে শেখায় তার নাম জেরিয়াট্রিক্স (geriatrics)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হিসেব হল—৯৭% ডাক্তারি ছাত্র জেরিয়াট্রিক্সের পাঠ নেয় না, একটা কারণ বোধহয় এই পেশায় আয় কম। প্রতি বছর ৩০০ জনেরও কম জেরিয়াট্রিক্স বিশেষজ্ঞ পাশ করে বেরোন, যদিও প্রতি বছর এর চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যায় জেরিয়াট্রিক্স বিশেষজ্ঞ অবসর নেন। এ ছাড়া জেরিয়াট্রিক মনোরোগবিদ, নার্স, সোশ্যাল ওয়ার্কারের অভাব তো আছেই। আমাদের দেশে চিকিৎসাবিজ্ঞানের স্নাতক বা স্নাতকোত্তর কোনো স্তরেই জেরিয়াট্রিক্স স্থান পায় না।

ডাক্তার ও নার্সিং পাঠ্যক্রমের সমস্ত স্তরে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও মৃত্যুপথযাত্রীদের যথাযথ যত্নের বিষয়টা গুরুত্ব পাক, নীতিনির্ধারণকারীদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাক—এমনটাই বলতে চাওয়া হয়েছে অতুল গাওয়াণ্ডের এই বইতে।

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. পুণ্যব্রত গুণ, এমবিবিএস, হাওড়ায় একটি শ্রমজীবী মানুষের জন্য ক্লিনিকের সর্বক্ষণের চিকিৎসক।

সবার জন্য স্বাস্থ্যের দাবিতে

গাজীর গান

আমি আগে করি জনগণের চরণ বন্দনা
তার পরেতে আমার গান শুনেন সর্বজনা শুনেন বন্ধুগণ . . .
শুনেন বন্ধুগণ দিয়া মন দেশের কাহানি
সম্প্রতি হইয়াছে যাহা লোক জানাজানি শুনেন স্বাস্থ্যের খবর . . .
শুনেন স্বাস্থ্যের খবর জবর খবর জনস্বাস্থ্যের কথা
সবার জন্য স্বাস্থ্য সবার চুক্তি পত্রে লেখা ছিল ঘোষণা পত্রে . . .
ছিল ঘোষণা পত্রে সবার স্বার্থে ২০০০ সালের মধ্যে
বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সবার করতে হবে বিশ্বে সবার জন্যই স্বাস্থ্য. . .
সবার জন্যই স্বাস্থ্য চুক্তি পত্র ছিল এই শর্তে
এখন দেখছি সেই সব চুক্তি ঢুকে গেছে গর্তে রেড্ডি কমিশন . . .
রেড্ডি কমিশন বলেছিল স্বাস্থ্য সবার সম্ভব
কে শোনে এই রেড্ডির কথা এটাই হল বাস্তব মোদের মোদী সরকার . . .

মোদের মোদী সরকার স্বাস্থ্য দরকার এই কথা বলে
স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় কমিয়ে কর দিলেন ছেড়ে বড়ো কোম্পানিকে . . .
বড়ো কোম্পানিকে লক্ষ কোটি কর দিচ্ছেন ছাড়
আর আমরা হলাম হাড় হাভাতে অপুষ্টিতে মর এ তো সোজা কথা . . .
এত সোজা কথা মাথা ব্যথা রোগ ব্যাধি হলে
গাঁটের টাকা খরচ করে চিকিৎসা নাও কিনে
যদি অর্থ থাকে . . .
যদি অর্থ থাকে কড়ি থাকে তবেই পাবে স্বাস্থ্য
অর্থ দিলে পাবে স্বাস্থ্য তবেই থাকবে সুস্থ তাহলে কী উপায় . . .
তাহলে কী উপায় নিরুপায় থেকো না আর
স্বাস্থ্য আমার স্বাস্থ্য তোমার স্বাস্থ্য অধিকার এসো লড়াই করি . . .
এসো লড়াই করি শপথ করি দিয়ে মন প্রাণ
সবার জন্য স্বাস্থ্য সবার এই স্লোগান করি নিবেদন . . .
করি নিবেদন জনগণ তোমাদেরি কাছে
বাঁচতে হলে লড়তে হবে আমরা আছি পাছে শুনেন বন্ধুগণ . . .॥

গাজীর গানে সুরে কথা: দীপক চক্রবর্তী

শব্দছক ৩

প্রস্তুতি:রুচিরা মজুমদার

সূত্র: পাশাপাশি: (১) আকার বাদ দিলে লবঙ্গ (৩) মাথার যন্ত্রণা এর উপসর্গ (৬) দাঁতের অসুখ (৭) মানসিক (৮) ব্লাডব্যাঙ্কে পাওয়া যায় (৯) কখনো এর সাহায্যে খাওয়ানো হয় (১০) ভিটামিন সি-এর অভাবে হয়। (১২) এক ধরনের পরীক্ষা (১৪) রোগ সারাতে এটাও দরকার। (১৬) এটা পেলে চেপে রাখবেন না। (১৭) টিউবারকিউলোসিস (১৮) চর্মরোগ উচ্চারণভেদে সোরিয়াসিস (২০) ডাক্তার রোগীদের এটার বিষয়ে জেনে নেন। (২১) জরায়ুর টিউমার। (২৩) রোগীর এই অবস্থা আশঙ্কাজনক। (২৭) রক্তের ক্যানসার (২৮) পরীক্ষাগার (২৯) সুস্থ চামড়ায় এটা ফোটালে ব্যথা লাগে (৩০) নেশার দ্রব্য, এখন এর তেমন চল নেই (৩১) পেনসিলে থাকে না কিন্তু নামে থাকে (৩২) ভিটামিনের অভাবে হওয়া হাড়ের অসুখ (৩৩) সর্দিজ্বরেও হতে পারেন (৩৪) পানীয় গরম রাখে।

উপরনীচ: (১) জল শোধনে লাগে (২) সাপের বিষ এতে সংগ্রহ করা হয় (৩) ছোটো জিনিসকে বড়ো দেখার যন্ত্র (৪) কার্ডিগ্রামের আগে বসে/ প্রতিধ্বনি (৫) পেটের অসুখের অবৈজ্ঞানিক ওষুধ (৬) জলাতঙ্ক রোগ প্রতিষেধকের আবিষ্কারের জন্য ইনি বিখ্যাত (১১) দেহযন্ত্র; প্রত্যঙ্গ (১২) মারণ রোগ (১৩) এর পরে উষা যোগ করলে দৌড়বীরকে পাবেন (১৫) হার্টকে সারাতে এই সার্জারি (১৯) শরীরের ভেতরে এর উপস্থিতি সমস্যাদায়ক (২২) হার্টের অসুখ (২৩) মৃত্যুমুখী রোগীদের আগে এটা দেওয়া হত (২৪) নাকের মধ্যে হয় (২৫) এই ব্রেড খাওয়া ভালো (২৬) জলভরা ফল (২৭) এর প্রোফাইল আছে (২৮) ডাক্তারি জার্নাল (৩১) ভিটামিন সি যুক্ত ফল (৩২) ডাক্তারদের এটা প্রায়ই নিতে হয়, উপায় থাকে না।

✿	✿	✿	১	২	✿	✿	৩	৪		৫	✿
✿	৬				✿	৭			✿	৮	
✿		✿	৯		✿	✿		✿	✿		✿
১০		১১	✿	✿	১২			১৩	✿		✿
✿	✿	১৪	১৫	✿		✿	১৬		✿	১৭	
✿	১৮			১৯		✿	✿	✿	✿		✿
✿	✿	✿	২০		✿	২১	২২		·		✿
২৩		২৪		✿	২৫	✿		✿	✿	✿	২৬
	✿		✿	২৭					✿	২৮	
	✿		✿	২৯		✿		✿	✿		✿
৩০		✿	৩১		✿	✿	✿	৩২			✿
✿	✿	৩৩		✿	✿	✿	৩৪		✿	✿	✿

উত্তর ৩৭ পাতায়